বসন্তে যৌবনের গর্জন

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো অমর ২১ ফেব্রুয়ারি'

বিশেষ অষ্টম-নবম ই-সংস্করণ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২১ ■ ৪৮তম বর্ষ

রাজ্য কাউন্সিল সভা

মিডিয়ার প্রচার নয় বাস্তব অভিজ্ঞতাই হোক ভিত্তি

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম সমুপস্থিত। অতীতের ন্যায়, এই রাজনৈতিক সংগ্রামেও দ্বি-বিধ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের অতীত ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে সাহসিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি,

বিজয় শঙ্কর সিংহ

এ রাজ্যের বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও কলুষিত রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য, প্রগতিশীল শক্তিসমূহের যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে, তার সাথে সাযুজ্য রেখে উপযুক্ত ভূমিকা পালনে পরিবার পরিজনসহ কর্মচারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

কমিটির উনিশততম রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী দ্বিতীয় রাজ্য কাউন্সিল সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরোক্ত আহ্বান জানান রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণ সংস্থা রাজ্য কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ সভা বিগত ১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং আমৃত্যু ঐ সংগঠনের নেতা কমরেড আর জি কার্নিকের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক তথা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অন্যতম সহ সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তথা সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অন্যতম জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

রাজ্য কাউন্সিল সভা পরিচালনা করেন সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য ও সহ-সভাপতিত্রয় প্রশান্ত দাস, গীতা দে ও মানস দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় দুটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালন করা হয়। প্রথম শোকপ্রস্তাব উত্থাপিত হয় প্রয়াত জি কার্নিক স্মরণে ও দ্বিতীয় শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এই সময়কালে প্রয়াত অন্যান্য বিশিষ্টদের প্রতি।

প্রারম্ভিক প্রস্তাবনা পেশ করতে গিয়ে প্রিয় সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন, রাজ্য সম্মেলনের পর প্রথম কাউন্সিল সভা ১৪-১৫ মার্চ ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে করোনা অতিমারির কারণে কাউন্সিল সভা বা কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করা না গেলেও সংগঠনকে গতিশীল রাখার জন্য এই সময়কালে সমিতির সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে একাধিক সভা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক ও অঞ্চল সম্পাদকদের নিয়ে ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে একাধিকবার। করোনা পরিস্থিতিতে সমস্ত অন্তর্ভুক্ত সমিতি বা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বস্তরের কর্মী নেতৃত্বরা সমভাবে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রতিপালন করতে না পারলেও একটা বড় অংশের কর্মী নেতৃত্বরা ধারাবাহিক ভাবে সংগঠনকে গতিশীল রাখা এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির করোনা ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ ও ত্রাণ বিলিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা প্রতিপালন করেছেন যা অভিনন্দনযোগ্য। করোনা মোকাবিলায় বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছেন পুঁজিবাদী দেশগুলি একে মোকাবিলা করতে গিয়ে যতটাই ব্যর্থ, অপরদিকে পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ততটাই সফল, এটা গোটা বিশ্বের কাছেই একটা শিক্ষা।

(১) তৃতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ঃ গত ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় করোনা সংক্রমণ ও অপরিকল্পিত লকডাউনের জোড়া আক্রমণে সমগ্র বিশ্ব, আমাদের দেশ ও রাজ্যে গরিব,

সভাপতিমণ্ডলী

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

হেলথ স্কীম প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে সংগঠনের পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ১০ /২১ তারিখ ঃ ১১-০২-২০২১

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম-এর ক্যাশলেস সুবিধার উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

মহাশয়া,

আপনি নিশ্চিত অবহিত আছেন যে, বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারী, পেনশনার্স সহ অন্যান্যদের চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে ক্যাশলেস সুবিধা চালু করেছেন (ওঃ বেঃ হেলথ ফর অল এমপ্লয়িজ এ্যান্ড পেনশনার্স ক্যাশলেস মেডিকেল ট্রিটমেন্ট স্কীম, ২০১৪)। এই ক্যাশলেস সুবিধা বর্তমানে ১ (এক) লক্ষ টাকার মধ্যে সীমায়িত আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে রোগ অসুখের আধিক্য ও জটিলতা এবং চিকিৎসা পরিষেবা খরচ বিপুলভাবে বৃদ্ধির ফলে চলতি ক্যাশলেস চিকিৎসার সুযোগ বহুলাংশে অপ্রতুল বলে প্রতিভাত হচ্ছে। এর ফলে রাজ্য সরকারী কর্মচারী, পেনশনার্স সহ অন্যান্য উপভোক্তারা বহুবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন।

ইতোমধ্যে রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য 'স্বাস্থ্যসাথী'-র চিকিৎসা পরিষেবা ঘোষণা করেছেন এবং প্রসারিত এই চিকিৎসা পরিষেবার উর্ধ্বসীমা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আশ্চর্যের হলেও সত্যি, সকল রাজ্যবাসীর জন্য এই প্রকল্প ঘোষিত হলেও সরকারী হেলথ স্কীমে আওতাভুক্ত বা সরকারীভাবে অপর্যাপ্ত চিকিৎসা ভাতা প্রাপকরা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ পড়েছেন।

এমত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারী, পেনশনার্স সহ অন্যান্য প্রাপক উপভোক্তাদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে বিশেষত জটিল রোগের চিকিৎসার (হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক, কিডনী ঘটিত অসুখ, ক্যানসার ইত্যাদির) সুযোগ দিতে ক্যাশলেস সুবিধার উর্ধ্বসীমা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত করতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি।

আশা করি, উল্লিখিত প্রেক্ষিতে আপনি বিষয়টি উপযুত গুরুত্ব দিয়ে সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করবেন এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিজয় শঙ্কর সিংহ
(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

কমরেড প্রশান্ত সরকারের জীবনাবসান

চলে গেলেন এমন একজন মানুষ, যিনি সাধারণ, তবুও অনন্য। যাঁর যাপিত জীবন সহজ, সরল, অনাড়ম্বর-পরিধেয় সাধারণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। যিনি কম বক্তা, বেশি শ্রোতা। মিতভাষী এই মানুষটির উচ্চকণ্ঠের বাক্যালাপ নিকট প্রতিবেশিও শুনতে পাননি। সহসা তিরস্কার ও প্রশস্তিতে অনভ্যস্ত, তবুও প্রয়োজনে কঠোর সমালোচনাতে অকুতোভয়। শ্রমজীবীর মতাদর্শে গভীর আস্থা চরম বিপর্যয়েও ছিল অটুট। পরিবার, সহকর্মী, সহযোদ্ধাদের কাছে ভরসাস্থল। অপরের অসুবিধা ও কষ্টে ব্যথিত হতেন, কিন্তু নিজের কষ্ট ও অসুবিধা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। অন্যায়ের সাথে আপস করতে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। এই মানুষটিই প্রশান্ত কুমার সরকার। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ রাত ১১.৩৫ মিনিটে। তাঁর সুদীর্ঘ ৮০ বছরের পথ চলা থেমে গেল। বেশ কিছুকাল যাবৎ কিডনি ও শ্বাসকষ্টজনিত অন্যান্য অসুখে ভুগছিলেন। ৩০ জানুয়ারি, ২১ রাত্রিতেই অসুস্থতা বোধ করেন। পরদিন ৩১ জানুয়ারি খুব ভোরেই তাঁর হৃদযন্ত্রে প্রবল আক্রমণের কারণে লবণহ্রদের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাত্র দু'দিন পরেই তিনি প্রয়াত হন। তাঁর এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত প্রয়াণের সংবাদে সংশ্লিষ্ট সকলেই শোকস্তব্ধ ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

যশোহর জেলার আদি নিবাসী হরেন্দ্রনাথ ও সরলাবালা সরকারের তৃতীয় সন্তান প্রশান্ত কুমার সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১ সালে জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রয়াত প্রশান্ত সরকারের আরও তিন ভাই ও দুই বোন। চাকুরি সূত্রে তাঁর পিতা-পিতৃব্য জলপাইগুড়ির চা-বাগানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর পিতা বেলাকোবা অঞ্চলে বিভিন্ন

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সদা সক্রিয় সংগঠন

৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রতিবাদ দিবস

মালদা জেলায় কর্মী সভা

বাঁকুড়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ

বর্ধমানে আলোচনা সভা

সম্পাদকীয়

আমরা আন্দোলনজীবী তাই গর্বিত

সম্প্রতি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি সংসদের উভয়কক্ষে, কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে চলমান ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে কটাক্ষ করে দুটি অশ্রুতপূর্ব মন্তব্য করেছেন,—(১) আন্দোলনজীবী এবং (২) প্যারাসাইট বা পরজীবী। যারা আমাদের অন্নদাতা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলালে, তবেই দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের খাদ্য জোটে, তাদের গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সম্পর্কে, তাদেরই ভোটে নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রের কার্যকরী প্রধান যখন এই ধরনের মন্তব্য করেন, তখন তাকে আলটপকা বলে ফেলা কোনো কথা বলে ভেবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে দুটি দিক থেকে বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে। এর একটি হলো, কেন তিনি এই মন্তব্য করলেন এবং অপরটি হলো, একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত আন্দোলন সম্পর্কে এমন ধরনের মন্তব্য করার শিক্ষা বা আদর্শগত প্রেরণা তিনি পেলেন কোথা থেকে?

আমরা দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের যিনি আনুষ্ঠানিক প্রধান বা রাষ্ট্রপতি হন, তিনি একজন ব্যক্তি হিসেবেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর অতীত কোনো রাজনৈতিক পরিচিতি থাকতেও পারে, আবার নাও পারে। যেমন বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু বা তাঁর আগে যিনি ছিলেন, সেই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পরিচিতি সকলেরই জানা। কিন্তু এ পি জে আব্দুল কালাম, যিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁর কোনো রাজনৈতিক পরিচিতি ছিল না। তিনি ছিলেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক পরিচিতির পরোক্ষ ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা থাকলেও, প্রত্যক্ষত সংবিধানের নির্দেশেই রাজনৈতিক পরিচিতি ব্রাত্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যিনিই নির্বাচন পরবর্তী পর্বে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হোন না কেন, তাঁকে প্রথমে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে নির্বাচিত হতে হয়। পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত দল বা জোটের নেতা নির্বাচিত হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে এই দ্বিতীয় পর্বের নির্বাচনে জনগণের কোনো ভূমিকা থাকেনা। জনগণ আর পাঁচজনের মতোই জনপ্রতিনিধি হিসেবেই তাঁকে নির্বাচিত করেন তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় দেখেই। আমাদের দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন।

তবে এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও রয়েছে। জওহরলাল নেহরু, তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী বা সাম্প্রতিক সময়ে ডঃ মনমোহন সিং—এঁরা সকলেই ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং ঐ পরিচয়টাই ছিল তাঁদের মুখ্য পরিচয়। একই কথা প্রযোজ্য অন্যান্য দল থেকে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, যেমন মোরারজি দেশাই বা ভি পি সিংহের ক্ষেত্রেও। কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী বা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষেত্রে বিষয়টা কিছুটা ভিন্ন। কারণ দৃশ্যত তাঁরাও একটি রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি হলেও, এই দলটির কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, এটি স্বয়ংশাসিত কোনো রাজনৈতিক দলও নয়। এর কার্যকলাপ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো হলেও, অন্তর্বস্তুর দিক থেকে এটির চরিত্র একটি গণসংগঠনের মতোই, যা পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের মতো একটি চূড়ান্ত মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন দ্বারা। যদিও ভোট রাজনীতির স্বার্থে আর এস এস-বি জে পি-র আন্তঃসম্পর্ককে পর্দার আড়ালে রাখার চেষ্টা করা হয়। এই লুকোচুরি খেলার একটা কারণও রয়েছে, যা জানতে হলে একটু পিছনে ফিরে দেখা প্রয়োজন।

মহাত্মা গান্ধীকে নাথুরাম গডসে হত্যা করার পর, গডসের সাথে আর এস এস-র সম্পর্ক প্রকাশ্যে চলে আসে। ফলস্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার আর এস এস-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। নিষিদ্ধ ঘোষণার পর, স্বাধীন ভারতে আর এস এস-র কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু সরকারী নিষেধাজ্ঞাই নয়, গান্ধীজীর হত্যার সাথে এই সংগঠনের নাম জড়িয়ে যাওয়ার ফলে তীব্র জনরোষের শিকারও হতে হয়। এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য সংঘের তৎকালীন তাত্ত্বিক নেতা গুরু গোলওয়ালকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানান। তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁর লিখিত আবেদন পত্রে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে আর এস এস শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করবে এবং কোনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবে না। গোলওয়ালকারের এই কৌশলী আবেদনে জওহরলাল নেহরুর মন গলাতে না পারলেও, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। মূলত তাঁর হস্তক্ষেপেই আর এস এস-র ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় (অবশ্য আর এস এসকে নিষিদ্ধ ঘোষণাও তিনিই করেছিলেন)।

একদিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ না নেওয়ার শর্ত সাপেক্ষে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। অথচ অপরদিকে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও পারস্পরিক বিদ্বেষের দগদগে ক্ষত এখনও শুকোয়নি। তাদের জন্য উর্বর এই জমিকে হাতছাড়া করতে চায়নি আর এস এস। তাই তারা এক কৌশলী পথ অবলম্বন করে। 'জনসঙ্ঘ' নামে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়, যার সুতো ধরা থাকে আর এস এস-র হাতে। উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও কেন জনসঙ্ঘ নির্বাচনী রাজনীতিতে সফল হতে পারেনি, তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে পাশ কাটিয়ে এইভাবেই আর এস এস বকলমে ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে।

ঐ জনসঙ্ঘেরই উত্তরসূরী বি জে পি। মাঝের একটি ঘটনার দিকে চোখ রাখলেই যোগসূত্রটা আরও একবার স্পষ্ট হবে। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে যে ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী সর্বদলীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে আর এস এসের নির্দেশে জনসঙ্ঘও অংশ নেয়। যদিও আদর্শগত দিক থেকে আর এস এস গণতন্ত্রের বিরোধী এবং বজ্রকঠিন কর্তৃত্বময় শাসনের পক্ষে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্প্রতি নীতিআয়োগের চেয়ারম্যান বলেছেন, দেশে অত্যাধিক গণতন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আবার, আর এস এস-র নেতা এবং বি জে পি-র সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার নরেন্দ্র মোদির সরকার গঠিত হওয়ার পর মন্তব্য করেছেন, "... এক শক্তিশালী নির্ধারক নেতৃত্ব একটি দেশের মানুষ যাকে তার পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করে। এই ধরনের নেতৃত্বের ধারা শুরু হয়েছে এবং গণতন্ত্র রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে।"

স্বভাবতই আদর্শগত অবস্থান অনুযায়ী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার পক্ষেই আর এস এস তথা জনসঙ্ঘের অবস্থান হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই সময় জরুরী অবস্থা বিরোধী মানুষের ক্ষোভকে প্রত্যক্ষ করে, রাজনীতির প্রাঙ্গনে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করার জন্য আর এস এস-র নির্দেশে জনসঙ্ঘ তাদের আদর্শগত অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছিল। জরুরি অবস্থা বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের একাংশ সহ বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দল ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে জনতা পার্টি আত্মপ্রকাশ করে। আর এস এস-র নির্দেশে জনসঙ্ঘও তাদের বাহ্যিক স্বাধীন পরিচিতি বিসর্জন দিয়ে জনতা পার্টির সাথে মিশে যায়। জনতা পার্টির মধ্যে তখন জনসঙ্ঘের দু'জন মুখ্য প্রতিনিধি হলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানি। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেসের বিরামহীন শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনতা পার্টি সরকার গঠন করেছিল। জাতীয় রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির এই ভাঙ্গনকে ব্যবহার করে আর এস এস যে তার সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন পূর্বতন জনসঙ্ঘীরা জনতা পার্টির মধ্যে থেকেও আর এস এস-র সদস্যপদ ত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন। একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ দলে শামিল হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার ভাগীদার হলেও, বাজপেয়ী বা আদবানি, এঁদের মুখ্য পরিচয় ছিল আর এস এস-র প্রতিনিধি।

জনতা পার্টির ভাঙনের পরে আর এস এস-র নির্দেশে পূর্বতন জনসঙ্ঘীরা আবার স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে, তবে জনতার দরবারে এযাবৎকাল প্রত্যাখ্যাত 'জনসঙ্ঘ' পরিচয় ঝেড়ে ফেলে ভিন্ন নামে—ভারতীয় জনতা পার্টি। স্বভাবতই এই নয়া নামও ছিল আর এস এস-র কৌশল। জাতীয় কংগ্রেসের দুর্বল হওয়া, জনতা পার্টির ভাঙন ইত্যাদির ফলে দেশীয় রাজনীতিতে যে স্পেস তৈরি হচ্ছিল, তাকে নয়া পরিচয়ে ব্যবহার করতে চেয়েছিল আর এস এস। তারপরের ঘটনাবলী সকলেরই জানা এবং যা বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গ নয়।

ধান ভাঙতে কিছুটা হলেও শিবের গীত গাওয়া হলো, এটাই বুঝে নেওয়ার জন্য যে, বি জে পি ক্ষমতায় থাকা মানে আসলে বকলমে আর এস এস-র ক্ষমতায় থাকা। একথা বাজপেয়ী সরকারের সময়েও যেমন সত্যি ছিল, বর্তমান মোদি সরকারের সময়েও একইরকম সত্যি। বাজপেয়ী ছিলেন কিছুটা নরম গোছের, আর মোদিজী অনেকটা কড়া ধাতের ইত্যাদি যা বলা হয়, তা সম্পূর্ণ অর্থহীন। দু'জনেই একই পাঠশালার ছাত্র। একই শিক্ষায় শিক্ষিত। দৃশ্যত তফাৎ যেটুকু, তা তৎকালীন সময় ও বর্তমান সময়ের শক্তি বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে। বাজপেয়ী যদি মোদির মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তেন, তাহলে কাশ্মীর বা রামমন্দিরে আর এস এস তখনই হাত দিত। স্বভাবতই মোদিজী যা বলেন ও করেন তা আর এস এস নির্দেশিত ও অনুমোদিত। গুজরাট দাঙ্গা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ—সবেতেই আর এস এস-র সিলমোহর থাকে। তাই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন ও তার প্রতি সংহতি জানিয়ে যাঁরা পথে নামছেন, তাঁদের আন্দোলনজীবী ও প্যারাসাইট বা পরজীবী বলে কটাক্ষ করা, দৃশ্যত মোদিজীর মন্তব্য হলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে এটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন, মেহনতী মানুষের লড়াই সম্পর্কে আর এস এসের অভিমত। আর এস এস আদর্শগতভাবেই মুসোলিনী ও হিটলারের মতো স্বৈর শাসকের অনুগামী। তারা চায় এমন এক কেন্দ্রীয়ভূত শাসন, যেখানে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। একমেবাদ্বিতীয়ম এক ব্যক্তির হাতেই থাকবে সমস্ত ক্ষমতা (হিটলার যেমন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী থেকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী চ্যান্সেলর পদে নিজেকে উন্নীত করেছিলেন)। যেখানে দেশের জনগণ সাংবিধানিক অধিকার সম্পন্ন নাগরিক নয়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির করুণাপ্রার্থী।

গণতন্ত্ররূপী সূর্যের আলোয় গণতান্ত্রিক অধিকারের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আন্দোলন ডালপালা মেলে। স্বভাবতই যারা বীজের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, তারা ডাল-পালার বিস্তার মানবে কী করে? তবুও যে গণতন্ত্রকে তারা মানে না, তাকে ব্যবহার করেই তারা ক্ষমতার মসনদে পৌঁছেছে (হিটলার, মুসোলিনীও তাই)। যে সংবিধানের তারা বিরোধী, সেই সংবিধান মেনেই মন্ত্রী-সান্ত্রী তৈরি করতে হয়েছে। যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে তারা দুর্বল প্রশাসনের লক্ষণ বলে মনে করে, সেই সংসদে দাঁড়িয়ে না চাইলেও কিছু কথা তাদের বলতেই হয়। পরিস্থিতির এই বাধ্যবাধকতার কারণেই কখনও কখনও আন্দোলনকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হজম করতেই হয়। কিন্তু কৃষক আন্দোলন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে তাকে আর হজম করা যাচ্ছে না। ওরা বোঝে বদহজমের মাত্রা ক্রমশ বাড়লে এক সময় ক্ষমতার মসনদে বসে থাকাটাই কঠিন হবে। তাই প্রথমে নয়া কৃষি আইনের মাহাত্ম্য প্রচার করে এবং বিভাজনের চেষ্টা চালিয়ে যখন আন্দোলনকে স্তব্ধ করা গেল না, তখন সরাসরি কটাক্ষ শুরু করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এমনকি হিটলারের কণ্ঠের অনুরণনও শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে। হিটলারের কাছে ইহুদি বংশোদ্ভুত সকলেই ছিল পরজীবী, আর মোদিজীর কাছে কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানানো শ্রমিক-কর্মচারী, ছাত্র-যুব-মহিলা, বুদ্ধিজীবী এরা সকলেই পরজীবী।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে মোদিজীর আলোচ্য মন্তব্যটি শুধুমাত্র আর এস এস-র আশ্রমিক শিক্ষার ফসল নয়। এর পেছনে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ আদানি-আম্বানি সহ জনগণের ১ শতাংশের (যারা মোট জাতীয় সম্পদের ৭৩ শতাংশের মালিক) প্ররোচনাও রয়েছে। কারণ কৃষির মতো একটি বৃহৎ ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে 'ফেবুলাস' অঙ্কের মুনাফা কামানোর যে সুযোগ রামভক্ত হনুমানের মতোই কর্পোরেট ভক্ত মোদিজী তাদের জন্য করে দিয়েছে, কৃষকরা আন্দোলন করে তা রুখে দিচ্ছে। গাত্রদাহ হওয়ারই কথা।

'আন্দোলনজীবী' বা 'প্যারাসাইট' প্রভৃতি যে সমস্ত মন্তব্য খোদ সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী করেছেন, তা তাঁর মরিয়া আর্তনাদ ছাড়া কিছুই না। কারণ তিনি বা তাঁর সরকার যদি পিছু হটে, তাহলে একদিকে গোলওয়ালকারের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার নাগপুরীয় সমালোচনার আশঙ্কা তো রয়েছেই, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হলো, এতদিন পর্যন্ত কর্পোরেটদের ব্লুআইড বয় থাকার ফলে ইলেকটোরাল বন্ড ও 'পি এম কেয়ার্স ফান্ড' নামক দুটি অস্বচ্ছ পাত্রে যেভাবে পুঁজির স্রোত এসে জমা হচ্ছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে। নাগপুরের গুরুভাইদের অসহিষ্ণু হয়ে পড়ার কারণ হলো, শ্রমিক-কৃষক তথা খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনের বিস্তার মানে বিভাজনের রাজনীতি পিছু হটবে, সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী দ্রুত রূপায়ন প্রক্রিয়া ধাক্কা খাবে। তবে তা নিয়ে এখনই গেল গেল রব যে উঠবে না, তা মোদিজী জানেন। কারণ ইতোমধ্যেই কাশ্মীর সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করা, কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের আর এস এস এজেন্ডাকে তিনি কার্যকরী করে ফেলেছেন। ফলে বাকিগুলোর জন্য এখনই আর এস এস-র দিক থেকে খুব বেশি চাপ থাকবে না। কিন্তু কর্পোরেট লবির কৃষি ক্ষেত্রকে চেটেপুটে খাওয়ার জন্য জিভ লকলক করছে। আদানিজী তো এর মধ্যেই বিশাল গুদাম তৈরি করে ফেলেছেন শস্য গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে বিপুল মুনাফা কমানোর জন্য। ফলে মোদিজী একদিকে কৃষক আন্দোলনকে ভাঙতে মরীয়া, অন্যদিকে অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন, কৃষির বাইরে যা কিছু রাষ্ট্রীয় সম্পদ তা দ্রুত তুলে দিতে হবে তাঁর 'মিত্রোঁ'দের হাতে। কৃষি ক্ষেত্রে এখনও ঢুকতে না পারার জন্য যে ক্ষোভ, তা যাতে কিছুটা হলেও প্রশমিত করা যায়। মানে কমপেনসেট করা আর কী।

মনে পড়ছে মুসোলিনীর উক্তি ঃ কর্পোরেট + সরকার= স্বৈরতন্ত্র। মুসোলিনীর এই উক্তির ভাবসম্প্রসারণ করলে দাঁড়াবে, শ্রীনরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকার।

এই শক্তির মোকাবিলায় ইতিহাস স্বীকৃত রাস্তা হলো, শ্রমিক-কৃষক সহ সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্য। যার নির্মাণ শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। এই ঐক্যকে মজবুত বনিয়াদের ওপর দাঁড় করানো প্রশ্নে মধ্যবিত্ত কর্মচারী অর্থাৎ আমাদেরও একটা ভূমিকা রয়েছে। যাও ইতিহাস স্বীকৃত। আমরা প্রস্তুত তো? □

১ মার্চ, ২০২১

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

কমরেড প্রশান্ত সরকারের জীবনাবসান

ধরনের জনহিতকর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, যার অন্যতম শিকারপুর অঞ্চলে মূলত তাঁর পিতার উদ্যোগেই গ্রামীণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীতে সরকারী গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়। তাঁর এক ভাই শিলিগুড়ির বামপন্থী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাঁর দাদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি ছিলেন। ফলে পারিবারিক পরিমণ্ডল তাঁকে সংগঠনমুখী করে তোলায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রয়াত সরকারের শৈশব ও কৈশোর কাটে তাঁর জন্মস্থান বেলাকোবায়। বেলাকোবা ও বাগরাকোটায় স্কুল ও কলেজের আই. এস.সি. পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করে জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক থেকে এল.সি.ই. পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে ওয়ার্ক-চার্জড হিসাবে শিলিগুড়িতে চাকুরি শুরু করার পর ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ সালে পূর্ত দপ্তরের জলপাইগুড়ি ডিভিশনের রাজগঞ্জে নিয়মিত পদে যোগদান করেন। পরে ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে কলকাতায় বদলী হয়ে আসেন।

চাকুরি জীবনের শুরু থেকেই তিনি আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে ওয়ার্ক-চার্জড বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশন ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে। ওয়ার্ক-চার্জড জীবনের যন্ত্রণা তাঁর উপলব্ধিতে থাকায় তিনি এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ক্রমেই তিনি কর্মচারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে থাকাকালীন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক হন। কলকাতায় বদলী হয়ে আসার পর তাঁর সংগঠনের কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায়। নিজস্ব সমিতি, টিরেট্টী বাজার, মহাকরণ অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির কাজে তিনি ছিলেন একজন দৈনন্দিন কর্মী। প্রশাসনের কাজেও তাঁর দক্ষতা ও নিষ্ঠা বহু নবীন কর্মচারীকে সংগঠনমুখী করে তোলায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি দীর্ঘকাল সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এসোসিয়েশনের মুখপত্র 'সংযোগ' ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর সভাপতিমণ্ডলী ও সম্পাদকমণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষর বাংলা বানানের ক্ষেত্রে নির্ভুল বানানের প্রয়োগ অসাধারণ প্রুফ রীডিং দুটি পত্রিকার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি তথ্যকথিত বড় বক্তা না হয়েও, ছোটো ছোটো বিষয়কে উপজীব্য করে কর্মী গড়ার কারিগর ছিলেন।

আত্মপ্রচার বিমুখ এই মানুষটি ছিলেন বহুগুণের অধিকারী---সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ট্রেড ইউনিয়ন, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তাঁর বিচরণ ছিল অনায়াস ও সাবলীল।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাসভবনে পরিবার ও পরিজনের উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর স্ত্রী শিপ্রা সরকার বামপন্থী মহিলা আন্দোলনের কর্মী। পরিবারে রয়েছেন তাঁর কন্যা, জামাতা ও নাতনি।

সংগ্রামী হাতিয়ার সম্পাদকমণ্ডলী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাধারণ অথচ অনন্য ও আমোঘহীন সংগ্রামী এই মানুষটির অমলিন স্মৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে ও তাঁর আত্মীয় পরিবার পরিজন সহযোদ্ধাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। একই সাথে তিনি আমাদের স্মৃতিতে চির জাগরুক হয়ে থাকবেন। □

প্রয়াত প্রশান্ত কুমার সরকার
অমর রহে
প্রয়াত প্রশান্ত কুমার সরকার
লালসেলাম

কেমন আছেন ত্রিপুরার কর্মচারীরা ?

আমরা সবাই জানি আগামী কিছুদিনের মধ্যে অন্য চারটি রাজ্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, হাবড়া ও আমডাঙ্গাতে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বক্তৃতা করেন। ওনার ভাষণে উনি বলেছেন, ত্রিপুরার শিক্ষক-কর্মচারীরা চতুর্থ বেতন কমিশনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই ত্রিপুরার শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশন চালু করেছেন, এই বক্তব্য শোনার পর এই রাজ্যের শিক্ষক-কর্মচারী নেতৃত্বরা অনেকেই ফোনের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য জানতে চাইছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মতো একজন সাংবিধানিক মর্যাদা সম্পন্ন পদাধিকারীর মুখ থেকে এ ধরনের অসত্য বক্তব্য অপ্রত্যাশিত। তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষক-কর্মচারীদের নিকট প্রকৃত ঘটনাটি তুলে ধরতে চাইছি।

কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করেছিল ০১-০১-২০১৬ থেকে। কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হওয়ার পর ত্রিপুরায় তৎকালীন রাজ্য সরকার পে এন্ড পেনশন রিভিসন কমিটি নিয়োগ করেছিল বেতন ভাতা নির্ধারণ করার জন্য। ঐ কমিটির নিকট কর্মচারীদের দাবি ছিল কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা যেন ঐ রাজ্যেও প্রদান করা হয়। রাজ্যের শিক্ষক, স্টাফনার্স, নার্সিং স্টাফ, পুলিশ, তহশীলদার প্রভৃতি পদে পে স্কেল এবং গ্রেড পে কেন্দ্রীয় সরকারের সমতুল্য পদের তুলনায় অনেকটাই কম রয়েছে। তাঁদের দাবি ছিল উপরোক্ত পদগুলির পে স্কেল এবং গ্রেড পে যেন কেন্দ্রীয় হারে নির্ধারণ করা হয়। পে এন্ড পেনশন রিভিশন কমিটি ঐ সমস্ত পদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে পে স্কেল ও গ্রেড পে সুপারিশ করেনি। পূর্বেকার পে স্কেল এবং গ্রেড পে অপরিবর্তিত রেখেই সকলের জন্য ২.২৫ ইনডেক্স প্রয়োগ করে বেতন বৃদ্ধি করে। বর্ধিত বেতন কার্যকর হয় ০১-০৪-২০১৭ সাল থেকে। গ্র্যাচুইটি ৪ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। বাড়ি ভাড়া ভাতা বেসিক পে'র ৮ শতাংশ করা হয় এবং সর্বোচ্চ মাসিক ভাতা ৩০০০ টাকা স্থির করে দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল অর্থের সংস্থান করা যায়নি বলে কর্মচারী-শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনের অনুরূপ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যায়নি। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে কিছুটা অসন্তুষ্টি ছিল। ২০১৮ সালের বিধান সভা নির্বাচনের পূর্বে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের প্রতিশ্রুতি ছিল, তারা সরকার গঠন করতে পারলেই মিলবে কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশন। সরকারে আসার পর অসমের প্রাক্তন মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে গঠন করা হলো এক্সপার্ট কমিটি। ঐ কমিটি রিপোর্টে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হলো ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী বেতন ভাতা প্রদান করা সম্ভব নয়। ফলে পে ব্যান্ড-I-এর চারটি লেভেলে মাত্র বৃদ্ধি করা হলো নিম্নরূপ ঃ

পে ব্যান্ড-I

লেভেল	পূর্বেকার ইনডেক্স	পরিবর্তিত ইনডেক্স	বৃদ্ধি
1	2.25	2.57	0.32
2	2.25	2.51	0.26
3	2.25	2.45	0.20
4	2.25	2.40	0.15

পে ব্যান্ড-II

5	2.25	2.34	0.09
6-10	2.25	2.57	0.32

পে ব্যান্ড-III

11-12	2.25	2.57	0.32
13	2.25	2.55	0.30

পে ব্যান্ড-IV

14-19	2.25	2.57	0.32

কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষক-কর্মচারীদের বৃদ্ধি ঃ

	লেভেল	বৃদ্ধি
পে ব্যান্ড-I	1-5	2.57
পে ব্যান্ড-II	6-9	2.62
পে ব্যান্ড-III	10-12	2.67
পে ব্যান্ড-IV	13	2.57

ত্রিপুরার শিক্ষক-কর্মচারীদের সর্বনিম্ন গ্রেড পে ১৩০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৭৬০০ টাকা। কেন্দ্রীয় শিক্ষক-কর্মচারীদের সর্বনিম্ন গ্রেড পে ১৮০০ টাকা সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা। ত্রিপুরার শিক্ষক-কর্মচারীদের গ্র্যাচুয়িটি, ভাতা, প্রভৃতি এক টাকাও বৃদ্ধি করা হলো না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের গ্র্যাচুয়িটি ২০ লক্ষ টাকা, বাড়ি ভাড়া ভাতা বেসিক পে'র ৮ শতাংশ সর্বোচ্চ কোনো সীমা নেই। প্রতিটি ভাতা উচ্চহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ত্রিপুরার শিক্ষক-কর্মচারীরা গত প্রায় তিন বছরে ১ শতাংশ ডি.এও পায়নি। এত বৈষম্য বঞ্চনার পরও প্রকৃত সত্যিটা স্বীকার না করে অসত্য কথা বলা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যা করার কথা ছিল তা তো করতেই পারলেন না। কেন কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করতে পারলেন না, তা স্বীকার না করে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-কর্মচারীদের বোকা বানানোর প্রয়াসের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক-কর্মচারীদের নিকট তাঁদের বিনীত অনুরোধ অসত্য তথ্য পরিবেশনায় বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য। □

[সূত্র ঃ ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচ বি রোড)-র প্রেস বিবৃতি।]

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি

● **মোদী রাজে রেকর্ড বেকারী ঃ** বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোদীর নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসেছিল বি জে পি।

● লকডাউনের আগে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে বেকারির হার দাঁড়ায় ৬.১ শতাংশ। যা গত ৪৫ বছরে সর্বাধিক।

● সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সি এম আই ই)-র হিসেব অনুযায়ী ২০২০-র ডিসেম্বর মাসে বেকারির হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.১ শতাংশে। যা গত ৬ মাসের মধ্যে সর্বাধিক।

● অক্সফামের সাম্প্রতিক সমীক্ষা জানিয়েছে, মহামারীর সময়ে মুকেশ আম্বানির প্রতি ঘণ্টায় আয় হয়েছে গড়ে ৯০ কোটি। বিপরীতে একশো ত্রিশ কোটি ভারতীয়ের সবচেয়ে কম আয়ের ২৪ শতাংশ সারা মাসে ৩ হাজার টাকা আয় করতেও হিমশিম খেয়েছে।

● ওই হিসেবেই বলা হয়েছে, মহামারীর সময়ে কাজ হারিয়েছেন মোট ১২.২ কোটি। এঁদের ৭৫ শতাংশ বা ৯.২ কোটি কাজ করতেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে।

● মহামারীর সময়ে অসংগঠিত পরিযায়ী শ্রমিকদের অন্তত ৩০০ জন মারা গিয়েছেন অনাহার, আত্মহত্যা, পথচলার ক্লান্তি, সড়ক এবং রেল দুর্ঘটনায়, পুলিশের নিপীড়নে এবং চিকিৎসা না পেয়ে।

● ২০২০'র এপ্রিলেই কাজ হারিয়েছিলেন ১ কোটি ৭০ লক্ষ মহিলা। কর্মহীন মহিলার সংখ্যা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রেল, তেল, প্রতিরক্ষা, টেলিকম, ব্যাঙ্ক, বীমা সবই বিক্রি করে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে মোদী সরকার। কাজ হারানো, শূন্যপদ অবলুপ্তির মুখে হাজারো কর্মী।

● **বেকারির নিরিখে দেশে প্রথম দশে বি জে পি শাসিত ৬ রাজ্য ঃ** বি জে পি আমলে কর্মসংস্থানের সঙ্কট তীব্র, বেড়েছে বেকারির হার। বি জে পি শাসিত রাজ্যগুলির পরিস্থিতি আরও খারাপ। সি এম আই ই'র ২০১৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের যে দশ রাজ্যে বেকারত্বের হার সব থেকে বেশি তার ছ'টিই বি জে পি শাসিত---ত্রিপুরা, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ।

মোদীর 'পঞ্চমুখে প্রশংসিত' উত্তরপ্রদেশে গত বছর বেকারত্বের হার ১১.৪ শতাংশ বেড়েছে। ২০২০-র এপ্রিলে সেই হার ছিল ২১.৫ শতাংশ। ২০১৭ সালের জুলাইয়ে ছিল ২.১০ শতাংশ। মার্চে বিধানসভায় রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীই জানিয়েছেন, ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ছিল ৩৩ লক্ষ ৯৩ হাজার। দু'বছরে ৩৪ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে বেকারত্ব। এগুলি নথিভুক্ত করা সংখ্যা। শ্রম দপ্তরের অনলাইন পোর্টালে নাম ওঠেনি এমন লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীও রয়েছে দেশের বৃহত্তম রাজ্যে। লকডাউনের পর দেশের সার্বিক বেকারত্ব আকাশ ছুঁয়েছে। সি এম আই ই'র রিপোর্ট থেকেই জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বেকারত্ব দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশে। ২০১৮ সালে ৫.৯১ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে তা বেড়ে হয় ৯.৯৫ শতাংশ। এই সময়ে দেশের গড় বেকারত্বের হার ৭.৭ শতাংশ-র থেকে বেশি।

বহু চর্চিত গুজরাট মডেলের কঙ্কালসার চেহারাও ক্রমেই স্পষ্ট। গ্রাম গুজরাটে বেকারি বৃদ্ধি হয়েছে ১১ গুণ। শহরে বেকারি বৃদ্ধি হয়েছে ৪ গুণ। এক সরকারী আধিকারিক জানিয়েছেন, সরকার 'জব ফেয়ার' করে। সেখান থেকে যুবকরা চাকরি পান। তারপর দেখা যায় এক বছরের মধ্যে তাঁরা ছাঁটাই হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বেকারির হিসেবে এই সংখ্যা নেই, কারণ বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে ছাঁটাই হওয়া যুবদের পরিসংখ্যান রাখার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত 'রাজ্যওয়াড়ি বেকারির হার' থেকে দেখা যাচ্ছে, গত সাত বছর ধরে গুজরাটের গ্রামে বেকারির হার বাড়ছে। গোটা দেশেই বাড়ছে। ২০১১-১২ সালে জাতীয় স্তরে বেকারির হার ছিল ৩৪, যা ২০১৮-২০১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৭। □

দশ বছর ধরে শুধু বঞ্চনা আর কথার খেলাপ

❑ ২০১১-তে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ছিল, "পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিটি মহকুমায় অন্তত দশটি করে বড়ো, মাঝারি শিল্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।... বেকারদের মুখে হাসি ফোটাতে তৃণমূল অঙ্গীকারবদ্ধ"—বেকারদের মুখে হাসি নেই, শিল্প হয়নি কোথাও!

❑ ২০১১-তে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ছিল, "গ্রামের আধা বেকার সহ এখন বেকারের সংখ্যা ১ কোটি। এদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এর জন্যে বিশেষ ভূমিকা নেবে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক"—চাকরি হয়নি, লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ। এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে কত চাকরি হয়েছে, সরকারই বলতে চাইছে না।

❑ রাজ্যে ১৫ থেকে ৬৫ বছরের মানুষের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৮ হাজার। তাঁদের মধ্যে কোনো না কোনো কাজ করতেন, এমন মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষের কিছু বেশি। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমির রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের সেই বেকারি, কর্মহীনতার হার ১৭.৪১ শতাংশে পৌঁছেছে গত মে '২০-তে। ঐ মাসেই রাজ্যে কর্মহীনের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটিতে পৌঁছায়।

❑ রাজ্যে সরকারী ক্ষেত্রে শূন্য পদ প্রায় ৬ লক্ষ। গত দশ বছরে পুলিশে কিছু নিয়োগ ছাড়া আর কোনো নিয়োগই করেনি সরকার, তবু মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন এবারের বাজেটে যে, গত দশ বছরে সরকার ৪ লক্ষ নিয়োগ করেছে!

❑ গত দশ বছরে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৫০ হাজার কাজ দিয়েছে সরকার, বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন। অর্থাৎ বুথ পিছু ১৪৩ জনের কাজ হওয়ার কথা। গত বছরে বলা হয়েছিল বুথ পিছু ১২৯ জন, অর্থাৎ গত এক বছরে বুথ পিছু নতুন আরও ১৪ জনের কাজ হয়েছে এবং তা হয়েছে লকডাউনের মধ্যেও!— বিশ্বাস করা যায়?

❑ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন যে শিক্ষক পদে সাড়ে ষোলো হাজার নিয়োগ করা হবে, অথচ যখন তিনি এটা বলেছিলেন, তখন থেকে নির্বাচনের দিন ঘোষণা ছিল কয়েক দিনের তফাৎ এবং সেটা হয়ে গেলে রাজ্য সরকারের আর নিয়োগের ক্ষমতা থাকে না, সেটা তিনি জানতেন। তা সত্ত্বেও তিনি সেটা বলেছিলেন শুধু নয়, উপরন্তু বলেছিলেন 'আগামী তিন বছরে' ৩৫ লক্ষ চাকরি দেওয়া হবে। নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে এমন ঘোষণা শুধু অনৈতিকই নয়, একেবারে অনধিকার চর্চা। তা সত্ত্বেও তিনি এটা করেছেন কারণ শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েই সরে পড়া তাঁর বহুদিনের পুরানো অভ্যাস।

❑ ২০১৫ সালের টেট পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়োগ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। পরীক্ষায় পাশ, কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে না। অপদার্থতা এমনই যে ২০১৭ সালে ফর্ম ফিলাপ করা ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার বন্দোবস্তটুকুও এখনও সরকার করতেপারেনি। যোগাযোগ করলে শিক্ষামন্ত্রী দায় অস্বীকার করছেন, পুলিশ লাঠিপেটা করছে।

❑ গ্রামস্তরে কাজ করেন প্রায় ৩০,০০০ ভিলেজ রিসোর্স পার্সন বা 'ভি আর পি'। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ডেকে বলেছিলেন 'ভালো করে ভোট করলে' ভোটের পরে মাইনে ১২,০০০ টাকা বাড়িয়ে দেবেন—ভোটের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতারিত হয়েই চলেছেন তাঁরা। একইভাবে কোয়ারিন্টাইন সেন্টার সহ নানা জায়গায় নানা রকমের কাজ অক্লান্ত ভাবে করে আসা 'জীবিকা সেবক'রা প্রতারিত হয়েই চলেছেন—গত ৪৪ মাস ধরে তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না!

❑ গত নির্বাচনের আগে তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি ছিল ৬০ হাজার গ্রুপ ডি নিয়োগের। আলাদা কমিটিও তৈরি হলো তার জন্যে। লক্ষ লক্ষ দরখাস্ত জমা পড়লো, পরীক্ষাও হলো। নিয়োগ পরীক্ষায় পাশ করেও ওঁরা এখন অসহায়, কারণ দরখাস্তগুলো পর্যন্ত কোথায়, তা এখন আর কেউ জানে না!

❑ চলতি বছরে যে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বাজেট মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন, তা বলছে যে চলতি বছরে মদ বিক্রি থেকে রাজ্য আয় করেছে ১১,৪৫৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে যে ২০১০-১১ সালে রাজ্য এই খাতে আয় করেছিল ১৮১২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ দশ বছরে মদ বেচে আয় বেড়েছে ৯৬৪৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা বা প্রায় ৫৩২.১৯ শতাংশ! কিন্তু এই মমতা ব্যানার্জীই ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাজ্যে 'মদের বন্যা' দেখেছিলেন। সিঙ্গুর কারখানাকে তাঁর মনে হয়েছিল 'ওয়াইন শপ' আর 'সুইমিং পুল'। এই ভণ্ডামীর শেষ হওয়া দরকার।

❑ বাজেট আরও জানাচ্ছে যে আগামী বছরে রাজ্যের ধার আরও বেড়ে দাঁড়াবে ৫,২৫,৮৬৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায়। এখন রাজ্যের ধার ৪,৮১,৩৯৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। যে বামফ্রন্টের ধারের কথা তিনি উঠতে বসতে শোনান, সেই বামফ্রন্টের ধার ছিল ২০১০-১১ সালে ১,৮৫,৬৬০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এটি কিন্তু শুধু বামফ্রন্টের আমলের ধার নয়—স্বাধীনতার পরের সময় থেকে ধরা হিসাব, যার মধ্যে স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের টাকাও ঢুকে আছে, কারণ স্বল্প সঞ্চয়ের টাকা রাজ্যের হিসেবে 'ধার' বলেই দেখানো হতো। এখন স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প উধাও। অর্থাৎ শুধু তৃণমূল সরকার একাই গত দশ বছরে ধার করেছে ২,৯৫,৭৩৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। মেলা-খেলা-ফূর্তি আর হেলিকপ্টারের প্রতি সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর নিদারুণ আগ্রহ এই ধার বাড়িয়েছে।

❑ সংখ্যালঘুরাও বঞ্চিত। তিনি ক্ষমতায় এলেই এদের উন্নতি করবেন, এমন তীব্র প্রচার চালিয়েছিল ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস। তখন বলেছিলেন ১০ হাজার আনরেজিস্টার্ড মাদ্রাসার অনুমোদন তিনি দেবেন ক্ষমতায় এলেই। গত দশ বছরে দিয়েছেন মাত্র ২৩৫টিকে। এখন ভোটের মুখে আমার একই গপ্পো ফাঁদছেন।

❑ সংখ্যালঘু ছাত্রদের সব ভাতাগুলিকে এক জায়গায় করে 'ঐক্যশ্রী' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছিল এই সরকার। গত বছরে আবেদন করেছিলেন ৪২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী। এ বছর জানানো হচ্ছে যে, তাঁদের মধ্যে ৩৭ লক্ষকে ভাতা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আবেদন করেও ভাতা পাননি। কেন পাননি, আর যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা কেন পেয়েছেন—কেউ জানে না।

❑ পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা লকডাউনের সময়ে রাজ্যে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের জন্যে 'স্নেহের পরশ' নামে এক প্রকল্প চালু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বছরের বাজেট বক্তৃতা বলছে ঐ প্রকল্পে ৪৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ২৯ জনকে, যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া হিসাবে অনুযায়ী শুধু রেলেই রাজ্যে ফিরেছেন ১৩ লক্ষ ৮৫ হাজারের বেশি শ্রমিক—প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি। এর থেকেই বোঝা যায় শুধু নামেই সার, রাজ্য প্রকল্পগুলির অবস্থা কী, আর বিপন্ন রাজ্যবাসীর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাবই বা কী! □

কেমন আছি আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা

২০১১ সালে বহু প্রতিশ্রুতির বন্যায় মানুষকে ভাসিয়ে, রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। হরেকরকম প্রতিশ্রুতি ছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্যও। কিন্তু পরবর্তী দশ বছরে প্রতিশ্রুতি পূরণ তো দূরের কথা, অর্জিত অধিকারসমূহ অস্বীকার করা ও কেড়ে নেওয়ার উপাখ্যান রচিত হয়েছে।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও মহার্ঘভাতা

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আন্দোলনের ইতিহাসে মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি নাগাদ তৎকালীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের শাসনকালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনগুলি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় মহার্ঘভাতা এবং ২৫ টাকা বিশেষ ভাতাসহ অন্যান্য দাবিতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) জমায়েত করেছিলেন। বিধান রায় এর জবাবে মাত্র দু'টাকা মহার্ঘভাতা মঞ্জুর করেছিল। কর্মচারীরা দু'টাকা মহার্ঘভাতা মানি অর্ডার যোগে তা সরকারের নিকট ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর জন্য জি পি ও-তে বিশেষ কাউন্টার খুলতে হয়েছিল। কর্মচারী আন্দোলন-সংগঠনের ইতিহাসে এ এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পরবর্তীকালে ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। নয় মাস এই সরকার স্থায়ী ছিল। কিন্তু এই সরকারের আমলে মহার্ঘভাতা, ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীদের নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদান সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি অর্জিত হয়।

১৯৬৯ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার তেরো মাস স্থায়ী হয়। এই সরকারের আমলেই প্রথম রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়। সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ গ্রুপ ডি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মহার্ঘভাতার পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় এক টাকা বেশি ছিল। এর ফলে সারা দেশের মধ্যে এই রাজ্যের কর্মচারীরা সর্বাধিক বেতন পেতে শুরু করেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রথম বেতন কমিশন গঠন এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি এই সময়তেই ঘটে। কমিশন তার সুপারিশ যথাসময়েই পেশ করে। কিন্তু ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হলে বেতন কমিশনের সুপারিশ এবং মহার্ঘভাতা প্রদানের নীতি ঠাণ্ডা ঘরে চলে যায়।

১৯৭১ সালে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় এবং ১৯৭২ সালে জালজুয়াচুরি নির্বাচনের মাধ্যমে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সরকারের পাঁচ বছরের ইতিহাস রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক মহাশয় ও অন্যান্য স্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি বঞ্চনার ইতিহাস। এবং একইসাথে তা আক্রমণের ইতিহাসও বটে। ১৯৭১ ও ১৯৭৫ সালে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে ৩৫ জন নেতৃত্ব বরখাস্ত হন।

বামফ্রন্ট সরকার ও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা

১৯৭৭ সালে রাজ্যে শ্রদ্ধেয় জননেতা জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই সরকার প্রতিশ্রুতি মতো ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান শুরু করে। বাম সরকারের ৩৪ বছরের শাসনে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত অটুট ছিল। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মতো দু'কিস্তি করে মহার্ঘভাতা প্রদান করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে তা কমিয়ে বছরে একবার করে মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়। বামফ্রন্টের আমলে কোনো সময় আর্থিক সঙ্গতির অভাবে একইদিন থেকে মহার্ঘভাতা প্রদান করা হয়তো সম্ভব হয়নি, কিন্তু মহার্ঘভাতার হার এবং বছরে অন্তত দু'বার করে মহার্ঘভাতা প্রদানের বিষয়টি অটুট ছিল। একই সাথে মহার্ঘভাতা বাবদ প্রয়োজনীয় আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে—এই দাবিও কর্মচারী সংগঠনগুলির সাথে বামফ্রন্ট সরকারও উত্থাপন করেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মহার্ঘভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে চরম কর্মচারী-শিক্ষকবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। অথচ ক্ষমতায় আসার পূর্বে এদের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে প্রতিশ্রুতি ছিল : "পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতোই শোচনীয়। পঞ্চম পে-কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এটা শেষ করে ষষ্ঠ পে-কমিশনকে আপ-টু-ডেট করতে হবে। এক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ২০০৮—এই ২৭ মাসের বেতন সরকার কোনোভাবেই দিতে রাজি নয়। এটা দিতে হবে। সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট হয়নি। সর্বোপরি শিক্ষা-স্বাস্থ্য-যাতায়াত ভাতা না থাকায় অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে বেতন প্রায় অর্ধেক। (নির্বাচনী ইশ্‌তেহার—পৃষ্ঠা ৪৯)

তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১ সালের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে অন্তত চারটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এগুলি হলো : (১) পঞ্চম বেতন কমিশনের অবশিষ্ট সুপারিশ কার্যকর করা ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন। (২) পঞ্চম বেতন কমিশনের ২৭ মাসের বকেয়া প্রদান। (৩) মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট করা অর্থাৎ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান এবং (৪) কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ন্যায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহনভাতা প্রদান করে কেন্দ্র ও রাজ্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার সমতা বিধান।

তৃণমূল কংগ্রেস যখন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আর যখন সরকারে আসে তখন রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু আর্থিক পরিস্থিতিকে অজুহাত করেই পাহাড়প্রমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া রেখেছে। এক্ষেত্রে চিত্রটি নিম্নরূপ—

● বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতার পরিমাণ ১৭ শতাংশ, ১ জানুয়ারি ২০২০ সাল থেকে আরও ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে মঞ্জুর হয়েছে। অবশ্য কোভিড পরিস্থিতিতে তা প্রদান স্থগিত রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে হয়তো তা প্রদান করা হতে পারে। এই অর্থে তাদের মহার্ঘভাতার পরিমাণ (১৭+৪) শতাংশ বা ২১ শতাংশ।

● রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারী কর্মচারী, বোর্ড কর্পোরেশনের কর্মচারী ও শিক্ষক মহাশয়েরা ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা কম পাচ্ছেন।

● বর্তমানে একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারীর ন্যূনতম বেতন ১৭ হাজার টাকা এবং গ্রুপ-সি কর্মচারী বা প্রাথমিক শিক্ষকের ন্যূনতম বেতন ২২,৭০০ টাকা। এই অর্থে ১ শতাংশ মহার্ঘভাতার পরিমাণ গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি কর্মচারীর যথাক্রমে ১৭০ টাকা ও ২২৭ টাকা।

● বর্তমানে ১ শতাংশ মহার্ঘভাতা দিতে রাজ্য সরকারের ব্যয় হয় প্রতি মাসে ৬২ কোটি টাকা। এই হিসাব অনুযায়ী একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারী ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা না পাওয়ায় প্রতি মাসে তার বঞ্চনার পরিমাণ (১৭০×১৮)=৩,০৬০ টাকা এবং গ্রুপ-সি বা প্রাথমিক শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার পরিমাণ (২২৭×১৮)=৪,৬৮৬ টাকা।

● অন্যদিকে ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করার সময় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, এর জন্য বছরে ২,২০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই হিসাব অনুযায়ী ১৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা না দিয়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের প্রাপ্য ২২০০×৬=১৩,২০০ (তেরো হাজার দুশো কোটি) টাকা আত্মসাৎ করছে রাজ্য সরকার।

● অন্যদিকে মহার্ঘভাতা দিতে পারা না পারা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মহার্ঘভাতার ন্যায্যতা স্বীকার করে নিয়ে, আন্দোলন গড়ে তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে রাজ্যের ন্যায্য পাওনা আদায় করে আনা। আর বর্তমান সরকার এই দাবিকে 'কুকুরের ঘেউ ঘেউ' আওয়াজের সাথে তুলনা করেছে।

● গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, রাজ্যে যখন বামপন্থীদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখনই রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পেয়েছে, আবার বামপন্থী সরকারের পতন ঘটার পর যখন বামবিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারপর থেকেই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

বেতন কমিশন : বামফ্রন্ট সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকার

বামফ্রন্ট সরকার ও বেতন কমিশন : এ রাজ্যে প্রথম বেতন কমিশন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় গঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে পরপর চারটি বেতন কমিশন গঠিত হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে। প্রতিটি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

● প্রতিটি বেতন কমিশনে শ্রমিক-কর্মচারীদের একজন করে প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন।

● প্রতিটি বেতন কমিশনের সুপারিশের কপি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়েছে। এবং তা প্রচার মাধ্যমও পেয়েছে।

● বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার সময় বকেয়া ডিএ সহ তা কার্যকর হয়েছে।

● বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গঠিত সর্বশেষ পঞ্চম বেতন কমিশন কার্যকর হয়েছে মাত্র এক মাসের মধ্যে।

● বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ঘোষিত প্রতিটি বেতন কমিশনের সুপারিশ কর্মচারী সংগঠনগুলির সাথে আলোচনার পর আরও উন্নত করে কর্মচারীদের স্বার্থে কার্যকর হয়েছে।

● প্রতিটি বেতন কমিশনের সুপারিশে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষকদের অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ক্রমশ উন্নত করা হয়েছে। বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের থেকেও উন্নত করা হয়েছে।

● প্রতিটি বেতন কমিশনে কর্মচারী, শিক্ষকরা বকেয়া পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাম শাসনে গঠিত চতুর্থ বেতন কমিশনে ১৯ মাস এবং পঞ্চম বেতন কমিশনে ৩২ মাসের বকেয়া প্রদান করা হয়েছিল।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও বেতন কমিশন

● এই প্রথম বেতন কমিশন গঠিত হলো যার চেয়ারম্যান হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর বশংবদই নন, যিনি বেতন কাঠামোর সংশোধন ও বেতন বৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করে আনন্দবাজার পত্রিকায় এক নিবন্ধও লেখেন।

● বিচারপতিকে বাদ দিয়ে সাধারণ একজন অধ্যাপককে কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

● তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সময় ২০১৫ সালে গঠিত হয়েছিল ষষ্ঠ বেতন কমিশন (স্মারক নং ৮০৭০ এফ, ২৭ নভেম্বর, ২০১৫)। এরপর প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। সুপারিশ আংশিক কার্যকর হয় ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি। এত দীর্ঘ সময় কোনো কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ হতে অতীতে কোনোদিন লাগেনি। পূর্বে কোনো কমিশন সুপারিশ দিতে দীর্ঘ পাঁচ বছর সময় নেয়নি।

● নজিরবিহীনভাবে কমিশনের রিপোর্ট কর্মচারী সংগঠনগুলিকে দেওয়া হয়নি।

● দীর্ঘসময় পর পে-কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও এর কোনো বকেয়া কর্মচারী, শিক্ষকদের দেওয়া হয়নি।

● অতীতের পে-কমিশনগুলিতে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখে তা বৃদ্ধি করা হতো। এই প্রথম বেতন কমিশনের সুপারিশে অর্জিত সুযোগ ছাঁটাই করা হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কমিশনের সুপারিশে বাড়ি ভাড়া ভাতার পরিমাণ ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১২ শতাংশ করা হয়েছে।

এযাবৎকাল বেতনক্রম নির্ধারণে সর্বভারতীয় ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচক ধরা হতো। এবারের কমিশনের সুপারিশে তা বাতিল করা হয়েছে।

সরকারী কর্মচারীদের অন্যান্য প্রসঙ্গ ঃ বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকার

অধিকার প্রসঙ্গ ঃ বামফ্রন্ট সরকার—১৯৭১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৩ জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীকালে জরুরি অবস্থা জারি হলে আরও ২২ জন অর্থাৎ মোট ৩৫ জনকে বরখাস্ত করা হয়। বামফ্রন্ট সরকার তার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সমস্ত রাজবন্দীকে বিনা শর্তে মুক্তি ও বরখাস্ত কর্মচারীদের পুনর্বহাল করে। বরখাস্ত থাকাকালীন প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা তাঁদের দেওয়া হয়।

● কংগ্রেসী শাসনে সংগঠন করার অপরাধে (!) পদোন্নতি স্থগিত, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ, দূর-দূরান্তে বদলি সহ বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত শাস্তিমূলক প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা বিনাশর্তে প্রত্যাহার করা হয়।

● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্বীকৃতি প্রত্যার্পণ করা হয় এবং রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সংগঠনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

● কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার সহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দেওয়া হয়।

● গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সংগঠনের সাথে নিয়মিত ও ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা চালু হয়।

● সত্তর দশকে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের অপরাধে কাটা বেতন ফেরত ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়।

● বিভিন্ন সমিতির রাজ্য সম্মেলনের দিনগুলিতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সবেতন ছুটি মঞ্জুর করা হয়।

● সরকারী চাকরিতে যোগদানের পূর্বে পুলিশ ভেরিফিকেশন থেকে রাজনীতির পূর্ব জীবন তদন্তের বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়।

● কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মচারীর পোষ্যকে চাকরিদানের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে শারীরিকভাবে অক্ষম কর্মচারীদের পোষ্যকেও চাকরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে গ্রুপ ইন্সিওরেন্সের ব্যবস্থা চালু হয়।

● অবসরকালীন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত করা হয়।

● সরকারী দপ্তরে নিয়োগে স্বচ্ছতা আনার জন্য কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়োগকে বাধ্যতামূলক করা হয়।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও কর্মচারী প্রসঙ্গ

তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছে ২০১১ সালে। এর পূর্বে তাদের প্রতিটি নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে তারা অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ২০০৯ সালের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছিল : "এছাড়া সরকারী ক্ষেত্রে সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদ আছে। এখানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোক নিয়োগ হলে, সাড়ে তিন লক্ষ শূন্যপদে লোক নিয়োগ হলে চাকরিরত সরকারী কর্মচারীদেরও প্রমোশন হতে পারে, যা বছরের পর বছর

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

লুঠেরাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যারিকেড দীর্ঘতর হচ্ছে

চলার পথে অভিজ্ঞতাই আমাদের শিক্ষক

আশীষ ভট্টাচার্য
সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

‘বিরুদ্ধতার চাবুক ওঠাও হাতে, স্বদেশভূমি লুঠ হয়ে যায় প্রতি দিন ও রাতে’—হ্যাঁ, আমাদের দেশের জাতীয় সম্পদ প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায় লুঠ হয়ে যাচ্ছে। বাইরের কোনো শক্তি নয়, দেশের নির্বাচিত সরকারের বদান্যতায় এই ‘লুঠ’ চলছে। করোনা আবহে দীর্ঘস্থায়ী অপরিকল্পিত লকডাউন ঘোষণা করে দেশের মানুষকে ঘরবন্দী করে সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগে অর্ডিন্যান্স জারি করে লুঠের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। লকডাউন পরবর্তী সময়ে সংসদ বসিয়ে, নয়া আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইন সঙ্কোচনের নামে গায়ের জোরে, মার্শাল নামিয়ে, প্রতিবাদী সাংসদদের সাসপেন্ড করে লুঠকে আইনী স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সময়কালে জাতীয় সম্পদ লুঠের কারবারি অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই আমাদের দেশের শাসকরা বুর্জোয়া জমিদারদের স্বার্থে দেশ পরিচালনা করেছে। তা সত্ত্বেও বৃহৎ শিল্প গঠনের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সদিচ্ছায় আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পের সাথে সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পেরও প্রসার ঘটে। পরিকল্পিত উন্নয়নের দিশা দেখা যায়।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুতে সোভিয়েত রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে হেলে পড়ে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা বই লিখলেন End of History। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ঘোষণা করেছিলেন, There is no Alternative। সমাজ বিকাশের ধারায় ধনতন্ত্রই নাকি সর্বোচ্চ ধাপ! উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়নের ঢেউ আছড়ে পড়ে পৃথিবীর দেশে দেশে। আশির দশকে মার্কিন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মিলটন ফ্রিডম্যানের ‘মুক্ত বাজার অর্থনীতি’র তত্ত্ব বিশ্বজুড়ে বাধাহীনভাবে বিকাশ লাভ করে। আমাদের দেশেও তার আঁচ পড়ে।

স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৯১ সালে কেন্দ্রের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং যখন বাজেট পেশ করছেন, তখন বিরোধী নেতা শ্রী লালকৃষ্ণ আদবানী সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ‘কংগ্রেস আমাদের আর্থিক নীতি হাইজ্যাক করেছে।’ সংসদীয় গণতান্ত্রিক নিয়মে আদবানীজির দল দেশের ক্ষমতায় এসে ১৯৯৮-২০০৩ ও ২০১৪ থেকে সেই ‘হাইজ্যাক’ হয়ে যাওয়া অর্থনীতিকে প্রয়োগ করছে। আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ও দেশীয় বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ রক্ষায় শ্রমজীবী জনগণের জীবন-জীবিকার উপর আঘাতকে তীব্রতর করছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি।

প্রথম পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়িজীর নেতৃত্বে ১৩ দিনের সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান আমেরিকার বিদ্যুৎ সংস্থা ‘এনরন’কে মহারাষ্ট্রে প্রবেশের ছাড়পত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাজপেয়িজীর নেতৃত্বে এন ডি এ জোট সরকার বিলগ্নীকরণ দপ্তর নামে নতুন দপ্তর সৃষ্টি করে। লোকে বলতো বেচা-কেনা দপ্তর। বাল্‌কো, নালকো, আমাদের রাজ্যের সাইকেল কর্পোরেশন সহ বহু দপ্তরের বিক্রীবাট্টা শুরু হয়। সেই সময় রবীন্দ্র ভার্মার নেতৃত্বে প্রথম শ্রম কমিশন গঠন করা হয়। মালিক স্বার্থে শ্রম আইন সংশোধনের সুপারিশ করে ভার্মা কমিশন। কিন্তু জোট রাজনীতির গেরাকলে তা বাস্তবায়িত হয়নি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বি জে পি দলের অবস্থান প্রথম থেকেই স্পষ্ট হলেও, জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় তাদের সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচী পুরোপুরি জনসমক্ষে উন্মোচিত করতে পারেনি।

এইজন্যেই আমাদের রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের কাছে বাজপেয়ীরা হচ্ছেন ‘Good BJP’। আজকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারে বি জে পি একাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। ফলে ওরা সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক ‘হিন্দুত্ব’বাদী কর্মসূচীকে সরাসরি বাস্তবে প্রয়োগ করছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আকাশ-বাতাসকে কলুষিত করছে। বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচী একইসাথে পাশাপাশি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলেছে। কর্পোরেটজীবীদের সাথে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদীদের জোট দেশীয় অর্থনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

শাসকদলের পক্ষ থেকে সরকারী প্রশাসনকে ব্যবহার করে দেশ জুড়ে ধর্মীয় উন্মাদনা, সংখ্যাগুরু জাতীয়তাবাদের নামে আধিপত্যবাদ, যুদ্ধ জিগির তুলে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মানুষকে ‘ধর্মীয় আফিং’-এ বুদ করে রেখে একতরফা ভাবে জাতীয় সম্পদ কর্পোরেট হাউসের কাছে বিক্রী করে দেওয়া হচ্ছে। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কার্ল মার্কস, আদিম পুঁজি সঞ্চয়ের অন্যতম শর্ত হিসেব ‘লুঠ’কে চিহ্নিত করেছিলেন। বর্তমানে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সরকারী বদান্যতায় অপ্রাপ্য সরকারী সম্পত্তির মালিকানা অর্জনের সুযোগের ফলে লুঠের বাহ্যিক চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু গুণগত চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি। এটাই ধান্দার ধনতন্ত্র। কেতাবী নাম ক্রোনি ক্যাপিটালিজম্।

লকডাউনের সময়ে পরপর দুটি ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০) দেশের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জি ডি পি-র যথাক্রমে ২৩.৯ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশ সঙ্কোচন ঘটেছে, যাকে অর্থনীতিবিদরা ‘মন্দায়’ আখ্যায়িত করেছেন। অক্সফাম রিপোর্ট অনুযায়ী লকডাউন পর্বে দেশের ১২.৫ কোটি সহ পরবর্তীতে মোট ২০ কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন। যখন বেকারীর হার ৯.১ শতাংশ (প্রতি ১০ জনে একজন বেকার), তখন আশ্চর্যজনকভাবে শেয়ার সূচক রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা তলানীতে ঠেকেছে। ফলে উৎপাদন হ্রাস ও কর্মচ্যুতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সেই সময়ে দেশের প্রথম একশ জন ধনপতির সম্পদ ও আয় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুকেশ আম্বানীর সম্পত্তি ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অক্সফাম-এর সমীক্ষায় অসাম্যের ভাইরাস ‘শিরোনামে’ প্রতিফলিত হয়েছে যে, মুকেশ আম্বানির এক ঘণ্টায় গড় আয় ৯০ কোটি টাকা, যা অর্জন করতে কেজন ভারতীয় অদক্ষ শ্রমিকের (দৈনিক আয় ১৪৪ টাকা) ১০ হাজার বছর লাগবে।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। পরবর্তীতে ব্যাঙ্কগুলি জাতীয় অর্থনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সরকারী বদান্যতায় ব্যাঙ্কের থেকে শিল্পপতিরা বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছেন। ঋণ শোধ না করে শিল্পপতিরা দেশ ছেড়েছেন। ঋণ নেওয়া, সেই ঋণের টাকায় সম্পত্তি কিনছেন, আবার সরকারও বছর বছর ধরে ঋণ মুকুব করেছে। অর্থাৎ মাছের তেলে মাছ ভাজা। ফলে ব্যাঙ্কগুলি রুগ্ন হয়েছে। এমন রুগ্নতার অছিলায় ব্যাঙ্কগুলিকে মার্জার করা হয়েছে। ২৭টা ব্যাঙ্ক মার্জারের পর ১২টা ব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে। এইবার সরকারের লক্ষ্য যারা ব্যাঙ্কের টাকা লুঠেছে, তাদের কাছেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সুবর্ণজয়ন্তীতে ব্যাঙ্ককে বেচে দেওয়া। এবারের বাজেটে দুটো ব্যাঙ্ককে বেসরকারীকরণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, অপর দিকে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের ব্লুপ্রিন্টও তৈরি হচ্ছে।

লকডাউনের সময়কালেই দেশের ৮টি বিমানবন্দর ৫০ বছরের লিজে দিয়ে দেওয়া হয় বেসরকারী মালিকানায়। তার মধ্যে ৬টি বিমানবন্দর লিজ দেওয়া হয় মোদি ঘনিষ্ঠ গৌতম আদানীর কাছে। এগুলির মধ্যে তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দর থেকে বছরে ১৭০ কোটি টাকার মুনাফা হয়। অথচ আদানী গোষ্ঠীর বিমানবন্দর পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতাই নেই। সম্প্রতি ভারত ও অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে আদানী বিরোধী প্রচার ব্যানার পরিলক্ষিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় আদানী গোষ্ঠীর সমুদ্র বন্দর তৈরি করার মধ্য দিয়ে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার আশঙ্কা প্রকাশ করে বিশ্ব পরিবেশ সংস্থা। সেই ক্ষেত্রেও দেশের বর্তমান প্রধাত্রনমন্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় তৎকালীন স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অরুন্ধতী ভট্টাচার্যকে অস্ট্রেলিয়ায় উড়িয়ে নিয়ে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে দেশের প্রধানমন্ত্রীর আদানীর চার্টার্ড প্লেন ব্যবহারের কথা সবাই জানি।

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম ১৯৫৬ সালে ৫ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৪০ কোটির বেশি। বিশ্বে বহু দেশের মোট জনসংখ্যার থেকেও এল আই সি গ্রাহক সংখ্যা বেশি। সেই বীমা সংস্থার টাকা শেয়ার বাজারে লগ্নীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বেসরকারী ব্যাঙ্ক আই ডি বি আইকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে এল আই সিকে বাধ্য করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এল আই সি ৪৭০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগে বাধ্য হয়েছে। এই অর্থ বীমাকারিদের প্রিমিয়ামের অর্থ। বীমাকারীদের অন্ধকারে রেখে তাদের অর্থ শেয়ার বাজারে লগ্নীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

ভারি বুনিয়াদী শিল্প গড়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্র যত সক্ষম হবে, রাষ্ট্রের শিল্পের ভিত্তি ততই মজবুত হবে। নেহরুর আমলে পরিকল্পিত অর্থনীতি শুরু হয় এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। তৈরি হয়েছিল পরিকল্পনা কমিশন, যোজনা কমিশন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সবটাই এখন তামাদি হয়ে গেছে। বাজার অর্থনীতির হাওয়ায় তৈরি হয়েছে নীতিআয়োগ। রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প বিক্রির অগ্রাধিকারের তালিকা তৈরি করাই নীতিআয়োগের মূল লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়। অথচ তিল তিল করে গড়ে ওঠা ২৪৩টি সংস্থা ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক এন্টারপ্রাইজের পথিকৃৎ। ২০ লক্ষের বেশি শ্রমিক-কর্মচারী এইসব সংস্থায় কর্মরত। দেশের মোট পুঁজির প্রায় ৩২ শতাংশ সৃষ্টি হয় এদের থেকেই। ১৯৯১-২০২০ এই ২৮ বছরে এইসব সরকারী সংস্থার শেয়ার বিক্রী করে কেন্দ্রীয় সরকার তার কোষাগারে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৪০১ কোটি টাকা জমা করেছে। এই বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। অথচ গত বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তুলেছে মাত্র ১৭, ৯৫৭ কোটি টাকা।

মূল্যবৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া। পেট্রোলের দাম সেঞ্চুরী ছুঁয়েছে। ডিজেলও তাই। গ্যাসের দাম হাজার টাকা ছুতে চলেছে। জুন, ২০১৪ অপরিশোধিত তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ছিল ১০৯.১ ডলার / ব্যারেল। তখন পেট্রোলের দাম ৭১.৫১ টাকা / লিটার। জানুয়ারী, ২০২১ সেই অপরিশোধিত তেলের দাম অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও দেশের বাজারে পেট্রোলের দাম সেঞ্চুরি ছুঁয়েছে। পেট্রোপণ্যের উপর আমদানী কর চাপিয়ে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। কর্পোরেটদের যথেষ্ট কর ছাড় দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে, তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা চাপানো হচ্ছে। অথচ করোনা সঙ্কটের কারণ দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। গত ৭ বছরে অর্থাৎ বর্তমান সরকারের সময়কালে কোনো ভারী শিল্পের উদ্বোধন হয়নি। শিল্পপতিরা বুনিয়াদী শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহী নয়। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প পুঁজি (M, C. M) থেকে পরিষেবামূলক পুঁজিতেই (M.M) উৎসাহ বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন সহ প্রায় সকলে যখন দাবি করছেন মানুষের হাতে অর্থের যোগান বাড়াতে বাজারকে, চাঙ্গা করতে আয়করের আওতা বহির্ভূত প্রতিটি পরিবারকে মাসে ৭৫০০ টাকা, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে মাসে ১০ কেজি খাদ্যশস্য দিতে হবে। রেগায় ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি দিতে হবে। তাতে কর্ণপাত করেনি কেন্দ্রের সরকার। কারণ তাদের দায়বদ্ধতা কর্পোরেটদের কাছে।

সাম্প্রতিক সময়ে মোদী সরকারের ৩টি কৃষি ও ৪টি শ্রমকোড আইন আদানী-আম্বানী সহ দেশী-বিদেশী বৃহৎ কোম্পানীগুলির অবাধ লুঠের ব্যবস্থাকেই সাহায্য করবে। কৃষি আইনের মধ্য দিয়ে ফসলের উৎপাদন-সংরক্ষণ-বিপণন ব্যবস্থাকে কর্পোরেটদের কাছে কৃষকের ভবিষ্যতকে সঁপে দিয়ে আত্মহত্যার পথকে প্রশস্ত করবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতার বাইরে রাখায় এবং মজুতের ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়ায় মজুতদারী, কালোবাজারী বৃদ্ধি পাবে। কৃষিতে কর্পোরেটের থাকা সুনিশ্চিত হবে।

৪৪টি শ্রম আইনকে ৪টি শ্রমকোডে পরিণত করা হয়েছে। মজুরী সংক্রান্ত কোড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন কোড, কাজের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোড এবং সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত কোড। বাজপেয়ীজির সময় রবীন্দ্র ভার্মা শ্রম কমিশনের সুপারিশ লাগু করা যায়নি জোট বাধ্যবাধকতা ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চাপে। কিন্তু এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও গায়ের জোরে শ্রম আইনগুলি পাশ করিয়ে নেওয়া হলো। লক্ষ শ্রমিকের অধিকার খর্ব করে কর্পোরেট হাউসের সোনায় সোহাগা। ৮ ঘণ্টা কাজের সময় ১২ ঘণ্টা। সপ্তাহে ৪ দিন কাজের সুপারিশ। ৫ দিনের কাজে দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে হয় ৪০ ঘণ্টা কাজ। এখন ৪ দিনের কাজে দৈনিক ১২ গণ্টা করে ৪৮ ঘণ্টা কাজ হবে। একই মজুরীতে কাজের সময় বৃদ্ধি করে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে অধিক মুনাফার গ্যারান্টি সৃষ্টি। ৩০০ জন কাজ করে এমন কারখানা ক্লোজারে বা শ্রমিক ছাঁটাইয়ে সরকারের অনুমতি লাগবে না। ধর্মঘটের অধিকারে হস্তক্ষেপ, ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্টের নামে হায়ার এন্ড ফায়ার। দেশের ৭০ শতাংশ কোম্পানী ও ৭৪ শতাংশ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেবে নতুন আইন। কর্পোরেট কা সাথ কর্পোরেট কা বিকাশ। আম আদমির সর্বনাশ করে খাস আদমির পৌষ মাস। সবটাই ‘Act of God’!

প্রতিরোধের ব্যারিকেড দীর্ঘতর হচ্ছে। ২৬ নভেম্বর, ২০২০ দেশব্যাপী ধর্মঘটে আসমুদ্র হিমাচল স্তব্ধ হয়েছে। ২৫ কোটি মানুষ ধর্মঘটে শামিল। শ্রমিকের পাশে দৃঢ় অবস্থানে কৃষক সমাজ। সবাই জোটবদ্ধ। সেদিন থেকেই কৃষকরা অবস্থানে। কৃষি আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান চলবে। ২০০ কৃষক শহীদ হয়েছেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়। কৃষক আন্দোলনের বার্তা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছেছে। ৮ ডিসেম্বর, ২০২০ কৃষকদের ডাকা ভারত বন্‌ধে শ্রমিকরাও শামিল হয়েছে। কর্পোরেট ঋণ মুকুব হবে ফি বছর, অথচ কৃষকদের ঋণ মুকুব হয় না। কৃষক আন্দোলনের চাপে সরকার দিশাহারা, শাসক জোটের অন্দরে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, বৃহৎ বুর্জোয়া ও ধনী কৃষকের দ্বন্দ্ব মুখোমুখি, কৃষক সমাজের জোট আরো শক্তিশালী হয়েছে। শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুরদের জোট লড়াইয়ের ময়দানে, আগামী দিনে আরো বৃহত্তর লড়াইয়ের মহড়া চলছে দেশজুড়ে।

আক্রান্ত গণতন্ত্র, আক্রান্ত বাক স্বাধীনতা, আক্রান্ত ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানের মর্মবস্তু—নানা ভাষা, নানা মত নানা পরিধান, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আজ আক্রান্ত। প্রতিবাদীদের খালিস্তানী, দেশদ্রোহী তকমায় আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সমগ্র দেশজুড়ে। মানুষের দুঃখ, দুর্দশার জন্য নয়া উদারবাদী নীতি নয়, দায়ি হচ্ছে সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি। ইন্ডিয়া ফর হিন্দুস। তাই এন আর সি, সি এ এ, এন পি আর এই আবহে এই বছর দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে পদার্পণ করবো আমরা। আমাদের শপথ—নয়া উদারবাদী নীতি ভারত ছাড়ো, জাত-পাতের বিভাজন সৃষ্টিকারীরা নিপাত যাক। লুঠেরাদের হাত থেকে রক্ষা করো দেশের সম্পদ। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভা

নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এসেছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনার পাশাপাশি, এই সঙ্কট মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার প্রসঙ্গগুলিরও পর্যালোচনা করা হয়। একই সাথে এই সময়কালে সংগঠন বিপর্যস্ত মানুষের পাশে সাধ্যমতো দাঁড়ানোর জন্য রাজ্যব্যাপী যে ভূমিকা পালন করেছে, তারও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণ করা হয়। এই সময়কালেই ২৬ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘট সহ বেশ কিছু কর্মসূচী

রূপায়ণ ও প্রতিপালনে সংগঠনের সর্বস্তরের উদ্যোগের বিষয়টিও আলোচনায় আসে।

(২) বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা ঃ

১৬ মার্চ, ২০২০ ঃ বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয় এবং ঐদিন সারা রাজ্যজুড়ে টিফিনের সময় বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১ মে, ২০২০ ঃ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের কর্মসূচী কোভিড মহামারী জনিত পরিস্থিতির কারণে শারীরিক দূরত্ব বিধি মেনে কেন্দ্রীয়ভাবে জেলা ও সমিতিগুলির দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

৪ জুন, ২০২০ ঃ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে ৭ দফা দাবিতে টিফিনের সময় জাতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

১৫-১৭ জুন, ২০২০ ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে সব জেলা ও কলকাতায় বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

৩ জুলাই, ২০২০ ঃ সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে কেন্দ্রীয় সরকার-এর কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও জনবিরোধী নীতিগুলি প্রণয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন ও বিক্ষোভের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

১২ জুলাই, ২০২০ ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে স্বেচ্ছায় রক্তদানের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে জেলা ও সমিতিগুলির উদ্যোগে কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড সময়কালে সারা রাজ্যে প্রায় দু-হাজার কর্মী-নেতৃত্ব রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন।

৯ আগস্ট, ২০২০ ঃ সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ''সেভ ইন্ডিয়া'' এর কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে ১০ আগস্ট, ২০২০ ''সেভ ইন্ডিয়া'' কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ঃ যৌথ আন্দোলনের মঞ্চ হিসেবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আত্মপ্রকাশের এই দিনটিকে স্মরণ করে ৫ দফা দাবি নিয়ে টিফিনের সময় বিক্ষোভের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনই ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানে সংগঠনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ঃ সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে কেন্দ্রীয় সরকারের বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারীকরণ বন্ধ করো, কৃষি আইন বাতিল ও শ্রম কোড প্রত্যাহার করার দাবিতে সারা রাজ্যজুড়ে টিফিনের সময় বিক্ষোভের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

১২ অক্টোবর, ২০২০ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০২০ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ''রাজ্য কনভেনশন'' অনুষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে জেলায় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

৯ নভেম্বর, ২০২০ ঃ ২৬ নভেম্বর, ২০২০ সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে নোটিশ প্রদান দিবস-এর কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যসচিব ও জেলা শাসকদের নোটিশ দেওয়া হয়। টিফিনের সময় ধর্মঘটের সমর্থনে জমায়েতের কর্মসূচী সহ ছুটির পর কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স করা হয়।

২৩-২৫ নভেম্বর, ২০২০ ঃ সারা রাজ্যজুড়ে টিফিনের সময় কর্মচারীদের মধ্যে লিফলেট বিলি সহ ধর্মঘটের প্রচার করা হয় এবং ২৫ নভেম্বর, ২০২০ কলকাতা ও জেলাগুলিতে সুসজ্জিত ট্যাবলো নিয়ে প্রচার করা হয়।

২৬ নভেম্বর, ২০২০ ঃ স্বাধীনতার পর নজিরবিহীন ঐতিহাসিক সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হয়। আমাদের প্রশাসনের অভ্যন্তরে ধর্মঘটীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায়।

৭ ডিসেম্বর, ২০২০ ঃ ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে টিফিনের সময় কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

৮ ডিসেম্বর, ২০২০ ঃ আন্দোলনরত কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ আহ্বানে অনুষ্ঠিত 'ভারত বন্ধ'-এর কর্মসূচীতে রাজ্য কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৬ ডিসেম্বর, ২০২০ ঃ দিল্লীতে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলির আহ্বানে কলকাতায় রানি রাসমণি এভিনিউ-এ জমায়েতের কর্মসূচী হয়।

২০-২২ জানুয়ারি, ২০২১ ঃ দিল্লীতে কৃষক সংগঠনগুলির ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলির আহ্বানে ধর্মতলায় তিনদিন ধরে ধর্ণা অবস্থানের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দু'দিন রাতের অবস্থানে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া প্রথম দিন মিছিল সহ অংশগ্রহণ করা হয়।

২৭ জানুয়ারি, ২০২১ ঃ ২৬ জানুয়ারি, ২০২১ দেশের সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন লক্ষাধিক ট্রাক্টর সহ কৃষক সমাজের রাজধানী অভিযানের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর নির্মমভাবে পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

ঐদিনেই সন্ধ্যায় অরবিন্দ সভাকক্ষে, আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রচারের গাইডলাইন সুনির্দিষ্ট করার জন্য সংগ্রামী হাতিয়ার সহ মুখপত্র সমূহের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ঃ কৃষক আন্দোলনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কোভিড সংক্রমণের কারণে লকডাউন ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য সাংগঠনিকভাবে সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার লক্ষ্যে অনলাইন যোগাযোগ প্রক্রিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব, অর্থসচিব ও স্বাস্থ্যসচিবকে একাধিকার e-mail-এ চিঠি দেওয়া হয় এবং সরকার আমাদের বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলার W-app-এ দেওয়া হয়। সর্বত্র জীবন্ত যোগাযোগ রেখে সংগঠন পরিচালিত হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে ৩ বার সভা হয়। জেলা সম্পাদকদের নিয়ে তিনবার ভার্চুয়াল সভা হয়। এছাড়া অঞ্চল সম্পাদকদের নিয়ে সভা করা হয়। সমিতি ও অঞ্চলগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে বসা হয়। এখন সর্বত্র সাংগঠনিক কাজ নিয়মিতভাবে শুরু করা হয়েছে।

(৩) করোনা তহবিল ঃ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রশাসনিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সংগঠনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ২০ মার্চ, ২০২০ চিঠি দেওয়া হয়।

এছাড়া পরবর্তীতে কর্মচারীদের কাছে সংগঠনের করোনা ত্রাণ তহবিলে ন্যূনতম ৫০০ টাকা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। লকডাউনের জন্য e-banking system-এ কেন্দ্র ও জেলার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়। কর্মচারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ও অভিনন্দনযোগ্য। এরপর জেলা ও কলকাতায় প্রান্তিক অসহায় মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়। আমফান ঝড়ে বিধ্বস্ত মানুষের পাশে থেকেও ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্ব কর্মী সংগঠকদের এবং বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় পেনশনার্সদের ভূমিকা প্রশংসনীয় ও অভিনন্দনযোগ্য। প্রায় ২০ হাজার পরিবারের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং ১৫ হাজার মানুষকে ''কমিউনিটি কিচেনে'' রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। লকডাউনের মধ্যে জেলা ও কলকাতাতে প্রায় ৭০ জন কর্মী সংগঠক নেতৃত্ব ব্লাড ব্যাঙ্ক ও হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান করেন।

(৪) আগামী কর্মসূচী ঃ

(ক) কোভিড পরিস্থিতিতেও বিভিন্নমুখীন সাফল্যকে সংহত করে সংগঠনের সর্বস্তরে কাঠামোগুলিকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপযোগী করে তুলে কর্মী-কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে আগামীতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে সর্বত্র উদ্যোগ গ্রহণ করে সংগঠনকে সার্বিকভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে।

(খ) যে সব সমিতি এখনও নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মসূচী করতে পারেনি তাদের নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মসূচী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সর্বভারতীয় সংগঠনের আহ্বানে ৭ দফা দাবি নিয়ে জাতীয় প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে। আমাদের রাজ্যে দিনক্ষণ পরবর্তীতে ঠিক করে জানানো হবে।

(ঘ) আগামী ৮ মার্চ, ২০২১ আন্তর্জাতিক নারী দাবি দিবসের কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে ও জেলাগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) ৯ মার্চ, ২০২১ জেলাগুলিতে জেলা সদরে ৪ দফা দাবি নিয়ে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৩ ঘণ্টার অবস্থানের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। ৫ মার্চ, ২০২১ দাবিগুলি নিয়ে ব্লক, মহকুমা ও সদরে ''ভেহিকেল জাঠা'' করতে হবে।

১৬ মার্চ, ২০২১ কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় রাণী রাসমণি এভিনিউ-তে ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ৩ ঘণ্টার অবস্থানের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে।

১২ মার্চ, ২০২১ দাবিগুলি নিয়ে কলকাতাতে ''ভেহিকেল জাঠা'' করতে হবে। সহযোগী সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা কেন্দ্রীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করবে।

দাবি ঃ (১) কেন্দ্রীয় হারে (১৮ শতাংশ) মহার্ঘভাতা অবিলম্বে দিতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণসহ চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। (৩) প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলী এবং শারীরিক মানসিক নির্যাতন বন্ধ কর। (৪) গণতন্ত্র, ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ করা চলবে না এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন সহ বহুমাত্রিক মেরুকরণের ঘৃণ্য রাজনীতি বন্ধ করো

(চ) **সফর ঃ** আগামী ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ব্লক স্তর পর্যন্ত জেলা সফর হবে। পরবর্তীতে কলকাতায় ৭টি অঞ্চলের সেক্টরগুলিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বর্ধিত সভা করা হবে।

(ছ) **সংগ্রামী হাতিয়ার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ (৫০ বছর) ঃ**

আলোচনা সভা ঃ (১) সংগ্রামী হাতিয়ারের দর্পণে রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের পেরিয়ে আসা ৫০ বছর (২) বিশ্বায়ন পর্বে মধ্যবিত্ত সমাজের বিবর্তন ও ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্রের ভূমিকা

(৩) **মতামত নির্মাণ ঃ** গণমাধ্যম বনাম ট্রেড ইউনিয়ন মুখপত্র [কেন্দ্রীয় ও জেলাগতভাবে অনুষ্ঠিত হবে]

এছাড়া সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রকাশিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লেখার ''সংকলন'' প্রকাশ করা হবে। সবশেষে কেন্দ্রীয় সমাপ্তি অনুষ্ঠিত হবে। [পরবর্তীতে সময় ও দিনক্ষণ জানানো হবে।]

(৫) সাংগঠনিক করণীয় বিষয় ঃ

(১) সদস্যভুক্তি কর্মসূচীতে নেতৃত্বকে দপ্তরে দপ্তরে সব কর্মচারীদের কাছে পৌঁছাতে হবে। ''meet the employees'' কর্মসূচী নিতে হবে। কিছু সমিতি ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ স্থির করে এবং পোষ্টার, লিফলেট করে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের কর্মসূচী করেছে এবং সাফল্যও পেয়েছে, যা অভিনন্দনযোগ্য। আগামী দিনে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনের অভ্যন্তরে অসংগঠিত কর্মচারীদের কাছে পৌঁছনোর জন্য পরিকল্পিত সাংগঠনিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম কেন্দ্রিক প্রচার সহ দপ্তরে দপ্তরে প্রতিটি কর্মচারীর কাছে সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। বিশেষ করে করোনা মহামারি সংক্রমণে ও লকডাউনে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তাকে পূরণ করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে।

(২) পত্রপত্রিকা গ্রাহকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। বকেয়াসহ গ্রাহক চাঁদা কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

(৩) রাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কীম / প্রজেক্ট ভিত্তিতে নিযুক্ত চুক্তিপ্রথায় কর্মচারীদের সংখ্যা কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে। এই ধরনের কর্মচারীদের স্বার্থে আমাদের আন্দোলনের বার্তা ওদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

(৪) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আগামী ৮ মার্চ, ২০২১ কেন্দ্রীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এবারের বিষয়—'বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অন্ধকার পেরিয়ে উঠুক নতুন সূর্যের ভোর'। পরবর্তীতে জেলাস্তরে একই বিষয়ে আলোচনা সভা সংগঠিত করতে হবে।

(৫) **সংগঠন তহবিল ঃ** জুলাই ও আগস্ট, ২০২১ মাসের বেতন থেকে ''সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযান'' (মোট বেতন ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকা, ৩০,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে ২০০ টাকা)। ফ্যামিলি পেনশনার্সদের জন্য ৫০ টাকা। মোট সংগৃহীত তহবিলের প্রাপ্য হবে জেলা ও কেন্দ্র—৬০ ঃ ৪০ অনুপাতে।

(৬) ১৯তম রাজ্য সম্মেলন ও করোনা তহবিলের সংগৃহীত অর্থের হিসাব দ্রুত কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দিতে হবে।

(৭) করোনা পরিস্থিতিতে স্থগিত থাকা সমিতির সম্মেলন / বার্ষিক সভা শুরু করতে হবে।

(৮) মার্জার ঃ ২টি সমিতির সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামীতে আরো কয়েকটি সমিতির সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে।

সর্বশেষ সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কর্মী হিসাবে সঠিক দায়িত্ব পালন একই সঙ্গে ভোটদাতা হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজ অতীত অভিজ্ঞতা ও সংগঠনের মতাদর্শকে পাথেয় করেই সুনির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করার। তিনি উপস্থিত রাজ্য কাউন্সিল সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অষ্টম রাজ্য সম্মেলনে উচ্চারিত সেই অমোঘ আহ্বান—''শ্রেণী বিভক্ত সমাজে আমরা শ্রেণী নিরপেক্ষ নই—আমরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে''।

সাধারণ সম্পাদকের উত্থাপিত প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ২১টি জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জেলা / অঞ্চলের পরিস্থিতি ও সংগঠন বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন আমাদের কাছে LOVE কথার মানে ভালোবাসা আর পুঁজিবাদের কাছে লাভ কথার অর্থ মুনাফা, আরও মুনাফা, সর্বোচ্চ মুনাফা। পুঁজিবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক দেশের সরকার একদিকে দেশে ঈশ্বরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, অপরদিকে সাংস্কৃতিক, জাতীয়তাবাদ আমদানির চেষ্টা চলছে। একই জিনিস বহু পূর্বে গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছিল ইতালিতে মুসোলিনীর সময়, জার্মানীতে হিটলারের সময়। একইভাবে ওখানেও জাতীয়তাবাদের কথা বলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে চাইলে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন। আজকে করোনা অতিমারীর সময় যেখানে গরিব মেহনতীর ওপর আঘাত নেমে এসেছে একইভাবে তার বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতও হয়েছে। কৃষক আন্দোলন আজ সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত একযোগে আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। শাসকশ্রেণী চক্রান্ত করবেন কিন্তু এর বিরুদ্ধে Determination দরকার, Confidence দরকার।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি Two Pillar Organisation। অন্তর্ভুক্ত সমিতি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ঐক্যবদ্ধ ভাবেই এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে পারবে। আমরা দাবি করছি সকলের কর্মসংস্থানের। বিকল্প ভাবনা তুলে ধরতে হবে সকল কর্মচারীর কাছে তাই ব্লক স্তরের কর্মসূচী। এই সরকার চাইছে প্রশাসনে বিভাজন ঘটানোর, কিন্তু আমাদের একযোগে পরিস্থিতি মোকাবিলায় জোর দিতে হবে।

সমস্ত আলোচনা এবং জবাবী বক্তব্য উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যরা গ্রহণ করার পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে আশীষ ভট্টাচার্য সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

দেবাশীষ রায়

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

কেমন আছি আমরা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা

আটকে আছে... সরকার-বিরোধী সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির সবাই যাতে দলের ঊর্ধ্বে উঠে এক সঙ্গে লড়ে, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সচেষ্ট হবে''। (সূত্র ঃ জাগো বাংলা, বিশেষ সংখ্যা, নির্বাচনী ইশ্‌তেহার, ২০০৯) তৃণমূল কংগ্রেসের ২০১১ সালের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে বলা হয়েছিল যে, ''তৈরি হবে ওয়ার্ক কালচার মিশন। রাজ্যে কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে আমরা বদ্ধপরিকর। সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাঁদের দীর্ঘদিনের যেসব বক্তব্য উপেক্ষিত ছিল, যেসব বঞ্চনা দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করেছেন, সেই বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনার মাধ্যমে আশু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। (সূত্র : নির্বাচনী ইশ্‌তেহার, ২০১১)।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দশ বছরের শাসনের ইতিহাস রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে বঞ্চনার ইতিহাস, ভাঁওতাবাজির ইতিহাস। একে আড়াল করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের বশংবদ সংবাদপত্রগুলি আর্থিক সীমাবদ্ধতা, বিপুল ঋণের বোঝা প্রভৃতিকে কু-যুক্তি হিসাবে হাজির করছে। আসলে এগুলি কোনো কারণই নয়। আর্থিক সঙ্কট বামফ্রন্ট সরকারেরও ছিল, ছিল বিপুল ঋণের বোঝা। তা সত্ত্বেও কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা পূরণে তাদের কোনো কুণ্ঠাবোধ ছিল না। আসলে আর্থিক সঙ্গতি নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে দুই সরকারের দুইরকম দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে একটি তথ্য পরিসংখ্যানই যথেষ্ট। বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে রাজ্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও পেনশন বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থের থেকে প্রকৃত খরচের পরিমাণ বেশি ছিল। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল বিপরীত। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় প্রকৃত খরচ অনেক কম হয়েছে। এক্ষেত্রে চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ

বামফ্রন্ট সরকারের সময় বেতন ভাতা খাতে বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)

আর্থিক বর্ষ	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০০৭-০৮	১২,০৭৮.৯৬	১২,৮০৮.৭৮
২০০৮-০৯	১৩,৮২০.৬৮	১৪,০৫৭.৭২

পেনশন খাতে বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

২০০৭-০৮	৩,৬৯৯.৪২	৩,৯৬৯.৪৮
২০০৮-০৯	৪,৩০১.৬০	৪,৩০১.৭২

তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বেতন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)

আর্থিক বর্ষ	বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়
২০১৪-১৫	৩৩,৬২৪.৩৩	৩০,৯৮৫.১০
২০১৫-১৬ (নভেম্বর ১৫)	৩৩,৬৯৩.১৭	৩২,৯১১.০৪

পেনশন খাতে বরাদ্দ প্রকৃত ব্যয়

২০১৪-১৫	১৩,৫৬৮.২৮	১২,১২৮.২৯
২০১৫-১৬ (নভেম্বর ১৫)	১৩,৮২৪.৭৯	১৩,২৮৬.৫২

(সূত্র ঃ বিভিন্ন বছরের বাজেট অ্যাট এ গ্লান্স)

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও কর্মচারী অধিকার প্রসঙ্গে ঃ 'সরকারী দপ্তরে যে সমস্ত সংগঠনের দপ্তর ছিল তা কেড়ে নেওয়া হয়। দাবিদাওয়া নিয়ে নবান্নে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কারণে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে দাজিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও বহরমপুরে বদলি করা হয়। নবান্ন সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারী দপ্তরে টিফিন বিরতির সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করা হয়। বিগত দশ বছরে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। সংগঠন করার অপরাধে দালাল সংগঠনগুলির আবদার মেনে ব্যাপক বদলি রাজ্য কর্মচারীদের করা হয়েছে। রাজ্য সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রতিনিধিদের যে সবেতন ছুটি পাওয়ার অধিকার ছিল তা বাতিল করা হয়। কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা আনার জন্য যে সব ব্যবস্থা ছিল তা বাতিল করা হয়। নিয়মিত পদে চুক্তি প্রথায় নিয়োগ চালু করে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করা হয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস এবং আর এস এস-র লোকজনের চাকরির সুযোগ করে দেওয়া হয়।

আসলে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন দুটি বা তিনটি দলের মধ্যে লড়াই নয়, এ লড়াই দুটি নীতির মধ্যে লড়াই। □

ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ ঃ কর্পোরেট চরণে সেবা লাগি

সুমিত ভট্টাচার্য

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারীকরণ (অবশ্যই লাভজনক শিল্প সংস্থাগুলির) প্রক্রিয়াকে আমাদের দেশে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি পর্বের প্রথম প্রজন্মের সংস্কার নামে অভিহিত করা হয়। আর দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারের নামে ব্যাঙ্ক, বীমার মতো রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নকীরণের কাজে হাত দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক তথাকথিত দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারকে কার্যকরী করার জন্য, একাধিক কমিটি বিভিন্ন সময়ে গঠন করে, সেই সমস্ত কমিটিগুলির সুপারিশ প্রকাশ করে প্রাথমিকভাবে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। যেমন, ১৯৯১ সালের ১৪ আগস্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর এম নরসিংহমের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হয়, তার সুপারিশ ছিল—(১) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস, (২) আর কোনো ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ না করা, (৩) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ ৪০ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা, (৪) ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি ও সরকারী অংশীদারিত্ব ৫১ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। ১৯৯৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর দ্বিতীয় নরসিংহম কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির বিশেষ সুপারিশ ছিল, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় সরকারী অংশীদারিত্বের পরিমাণ ৩৩ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ২৬ শতাংশে নামিয়ে আনা। ১৯৯৫ ও ২০০৬ সালে দুবার গঠিত এম এস তারাপোড়ে কমিটিও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণের সুপারিশ করে।

২০০৩ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কারস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গঠিত এস সি গুপ্ত কমিটির রিপোর্টে 'ব্যাঙ্কিং' সংযুক্তিকরণ বা মার্জারের পক্ষে সওয়াল করা হয়। এছাড়াও ঐ কমিটি অ্যাক্যুইজেশন বা অধিগ্রহণের প্রস্তাবও রাখে। একই উদ্দেশ্যে গঠিত লাহিড়ী কমিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফ ডি আই) এবং বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ (এফ আই আই)-এর পরিমাণ ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশ করার সুপারিশ করে।

২০০৭ সালে গঠিত হয় রঘুরাম রাজনের নেতৃত্বাধীন কমিটি। এই কমিটিও পূর্বসুরীদের পথ অনুসরণ করে। তাদের সুপারিশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের পক্ষেই সওয়াল করে। তাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ছিল ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ, ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ধরনের কাজের আউট সোর্সিং, সমবায় ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকে ধাপে ধাপে বন্ধ করে দেওয়া এবং স্বল্প মূলধনের ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া। রঘুরাম রাজন কমিটির পরেও আরও বেশ কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়েছে। যেমন, হুদা কমিটি, বার্মা কমিটি। বলাবাহুল্য এই কমিটিগুলির সুপারিশও ছিল অনুরূপ। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অনুপ্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি।

ব্যাঙ্কের পাশাপাশি বীমা ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্যও বিভিন্ন সময়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এই নিবন্ধে আমরা আলোচনাটাকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখছি।

রাষ্ট্রের জনকল্যাণকামী ভূমিকার অঙ্গ হিসেবে ব্যাঙ্ক শিল্পের জাতীয়করণ করা হয়েছিল। নয়া উদারবাদী অর্থনীতির পথে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে পরিচালনা করা যখন শুরু হয়, তখন ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক ভূমিকাও প্রত্যাহৃত হতে শুরু করে। এরই একটি অংশ হলো, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বেসরকারী মালিকানাধীন করা। নব্বই দশকের গোড়া থেকে শুরু করে পরবর্তী পর্বে কেন্দ্রে যে সরকারই এসেছে, সকলেই এই পথ ধরে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে। তবে মধ্যবর্তী পর্বে বিভিন্ন সময়ে সংসদের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের জোরালো উপস্থিতি এবং ব্যাঙ্কের সর্বস্তরের কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ লাগাতার আন্দোলন ও ধর্মঘটের চাপে সংস্কার প্রক্রিয়ার গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনও এই সময়কালে ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্যাঙ্কিং সেক্টরের কর্মচারী সহ সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সংসদের ভিতরে ও বাইরে ব্যাঙ্ক শিল্পকে রক্ষা করার জন্য যে ভূমিকা পালন করেছে, তার ফলে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই ক্ষেত্রটির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে পারেনি দেশের শাসকশ্রেণী। এর জন্য বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। বলা হয়েছে, তারা নাকি একটি বাতিল হয়ে যাওয়া মতাদর্শকে (মার্কসবাদ) আঁকড়ে ধরে থেকে দেশের সর্বনাশ করেছে। বিশ্ব অর্থনীতির সাথে দেশীয় অর্থনীতিকে জুড়ে দেওয়ার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ২০০৮ সালে সাবপ্রাইম ঋণ সঙ্কটের ধাক্কায় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দৈত্যাকৃতি বেসরকারী ব্যাঙ্ক ও বীমা সংস্থাগুলি মুখ থুবড়ে পড়ল, তখন তার ধাক্কা আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও বীমা শিল্প সামলে নিতে পারল। ইউরোপের অনেকগুলি দেশ মুখ থুবড়ে পড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'বেইল আউট' করতে গিয়ে নিজেরাই ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল (Sovereign Debt Crisis)। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ও বীমা ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারী সহ সর্বস্তরের মেহনতী মানুষের আন্দোলন ও বামপন্থী শক্তির। তারা অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন না করলে, 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া' বা লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনকে রক্ষা করা সম্ভব হতো না। অথচ যারা বামপন্থীদের গাল পেড়েছিলেন, তারা এই সহজ সত্যটাকে স্বীকার করার সাহস দেখাতে পারেননি।

মোদি জমানার বৈশিষ্ট্য হলো, নয়া উদারবাদের সমস্ত দাঁত ও নখ বের করে হিংস্র প্রয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রও এর বাইরে নয়। উপরোক্ত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ, যা শাসক শ্রেণীর প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন কার্যকরী করা যায়নি, নরেন্দ্র মোদি, নির্মলা সীতারমন এন্ড কোম্পানি সেই কাজে ইতোমধ্যেই হাত দিয়েছে। এর প্রথম ধাপটি হল বড় বড় ঋণখেলাপি শিল্পপতিদের ঋণ মকুব করে দিয়ে, বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আর্থিক স্বাস্থ্যকে দুর্বল করে দেওয়া। সম্প্রতি একটি 'রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট'-র চত্বরে ৫০ জন বড় অঙ্কের ঋণখেলাপির একটা তালিকা প্রকাশ করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ঐ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে হীরে ব্যবসায়ী মেহুল চোক্সির নাম। নরেন্দ্র মোদির অতি ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ীর ৬৮ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হয়েছে। ঐ তালিকায় রয়েছে আই পি এল কেলেঙ্কারির মাস্টার মাইন্ড লোলিত মোদি। মদের ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়া এবং আর এস এস ঘনিষ্ঠ যোগগুরু রামদেবের নামও। আরও একটি মজার বিষয় হলো এই অসাধু ব্যবসায়ীরা সব থেকে বেশি যে ব্যাঙ্কটির ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে, তার নাম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বা পি এন বি। অথচ ঋণ মকুবের পরবর্তী ধাপ মার্জার বা সংযুক্তিকরণ পর্বে ঐ পি এন বি-র সাথেই ইউ. বি. আই সহ আরও কয়েকটি ব্যাঙ্ককে জুড়ে দেওয়া হলো। সবল ব্যাঙ্কের কাঁধে দুর্বল ব্যাঙ্ককে না চাপিয়ে, উল্টোটা করা হলো। আসলে চোকসি, মালিয়া, রামদেব প্রভৃতি ঠগবাজদের কৃপায় পি এন বি-র যে ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা, তা আড়াল করার জন্যই মোদি সরকারের এই উল্টোপুরাণ।

মোদি সরকারের গেম প্ল্যান হলো দ্রুততার সাথে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারীকরণের মাধ্যমে, এগুলির মালিকানা সেই সমস্ত শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়া, যারা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ মেরে ফেরার হয়েছে। এক কথায় চোরকেই পাহারাদার সাজানো। ২০২১-২২ আর্থিক বছরের বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি এন বি এবং ব্যাঙ্ক অব বরোদা বেসরকারীকরণের প্রস্তাব করেছেন। যদিও দুটি ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ৬টি ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণ হতে চলেছে। কারণ পি এন বি-র সাথে জুড়ে গেছে ইউ বি আই এবং ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সাথে যুক্ত হয়েছে বিজয়া ব্যাঙ্ক ও দেনা ব্যাঙ্ক। একাধিক ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে আকারে একটি বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করে লোভনীয় তোফা হিসেবে তুলে দেওয়া হচ্ছে শিল্পপতিদের হাতে। সংযুক্তিকরণ ছাড়াও আর একটি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করেছে মোদি সরকার। যা হলো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ কাট-ছাঁট করে সরকারী কোষাগার থেকে মূলধন যোগানো হয়েছে পি এন বি এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদাকে। অর্থাৎ জনগণের অর্থ যারা আত্মসাৎ করল, তাদের হাতেই ব্যাঙ্কগুলিকে তুলে দেওয়ার আগে জনগণের করের টাকায় ব্যালান্সশিটের চেহারাটা ভালো করে নেওয়া হচ্ছে।

প্রতিটি ত্রৈমাসিকে কর্পোরেটদের যে পরিমাণ ঋণ মকুব করা হয়, তার ভগ্ন্যাংশ পরিমাণ ঋণও সারা বছরে ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রে মকুব করা হয় না। কৃষকরা এক বছর ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে, পরের বছর চাষের জন্য ঋণের আবেদন বাতিল করে দেওয়া হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, মোদি সরকারের কর্পোরেট তোষণ নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং জাতীয় ফেডারেশনগুলি সহ বামপন্থী দলগুলি লাগাতার প্রতিবাদ করলেও, এ রাজ্যের শাসকদলের এই বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ বিরোধী আন্দোলনেও তাদের দেখা পায় না। অথচ ছদ্ম বিরোধিতার প্রবল শব্দে আমাদের কান ঝালা-পালা। □

পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার্স সমিতির বিক্ষোভ সভা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির উদ্যোগে ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ সারা রাজ্যে মহকুমাস্তর থেকে রাজধানী কলকাতায় পেনশনার্সদের উদ্যোগে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হলো। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের কর্মচারী ও পেনশনারদের প্রাপ্য ২১ শতাংশ মহার্ঘভাতা রিলিফের ক্ষেত্রে চরম বঞ্চনার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার, প্রহসন মূলক ১ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ৩ শতাংশ মহার্ঘভাতা রিলিফ ঘোষণা করে প্রাপকদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন। রাজ্যের পেনশনার বন্ধুরা এর বিরুদ্ধে রাজ্য ব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

কেন্দ্রীয় সরকার নতুন তিনটি কৃষি আইনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সর্বনাশ ও কর্পোরেট পুঁজির লুটের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে। পেনশনার বন্ধুরা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এই তিনটি কৃষি আইন বাতিল করার জন্য সুতীব্র দাবি উত্থাপন করেন।

কলকাতায় এই বিক্ষোভ শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় ও দক্ষিণ কলকাতায় হাজড়া মোড়ে অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামবাজারে বিক্ষোভ সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিনহা বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিখিপতি দে।

হাজড়া মোড়ের সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও পেনশনার্স সমিতির নেতৃত্বৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন পেনশনার্স সমিতির সহ সভাপতি ভানুদেব চক্রবর্তী। □

রক্তদান কর্মসূচী

গত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। হাইকোর্ট ভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী রাজেশ বিন্দাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। মোট ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। বিচারপতি নিজেও ছিলেন অন্যতম রক্তদাতা। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
48th Year, 8-9th Special E-Edition, January-February 2021
Regd. No. : 18484/71

এক কাল্পনিক কথোপকথন

সুমিত ভট্টাচার্য

পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী সুইডেনের গ্রেটা থুনবার্গ তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে পরিবেশ রক্ষার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য 'ফ্রাইডেজ ফর ফিউচার গ্লোবাল ইনিটিয়েটিভ' নামে একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম গড়ে

তুলেছেন। এই প্ল্যাটফর্মেরই অন্যতম সদস্য ব্যাঙ্গালোরের ২২ বছর বয়সী পরিবেশকর্মী দিশা রবি। সম্প্রতি ভারতের কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করে সোশ্যাল মিডিয়ার করা গ্রেটা থুনবার্গের একটি পোস্টকে শেয়ার করেছিলেন দিশা। এই অপরাধে (?) গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাকে নিজ বাসভবন থেকে তুলে নিয়ে যায় দিল্লী পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

দিশাকে গ্রেপ্তারের ঠিক দু'দিন আগে, ১১ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়ার কোতলপুর ব্লকের ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী মইদুল মিদ্যা সংগঠনের ডাকে নবান্ন অভিযান কর্মসূচীতে শামিল হয়েছিলেন। সব বেকারের কাজ চাই এবং রাজ্য সরকারী দপ্তরের শূন্যপদগুলি স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করতে হবে—মূলত জনস্বার্থবাহী এই দুটি দাবিকে সামনে রেখে আয়োজিত গণতান্ত্রিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার অপরাধে (!) দরিদ্র ঘরের সন্তান, পেশায় অটোচালক মইদুল মিদ্যাকে পুলিশের লাঠি ও লাথির ঘায়ে প্রাণ দিতে হল। ঐদিন রাজ্য সরকারের দলদাস পুলিশ লাঠি, টিয়ার গ্যাস, জলকামান প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে যৌবনের আকৃতিকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

প্রায় একই সময়ে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনার আপাতদৃষ্টিতে কোনো যোগসূত্র নেই। দিশা এবং মইদুলের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয়েছে। তা হলো, কেন্দ্রের শাসকদল ও রাজ্যের শাসকদল উভয়েই ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া উত্থাপনের সংবিধান স্বীকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও মেনে নিতে নারাজ। অর্থাৎ উভয়েই চরিত্রগতভাবে স্বৈরতান্ত্রিক। তা হলে, এক স্বৈরতন্ত্রের বিকল্প, আর এক স্বৈরতন্ত্র হতে পারে কি? বিচার করবেন এ রাজ্যের মানুষ।

ব্যাঙ্গালোরের দিশা ও বাঁকুড়ার মইদুল পরস্পরকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও, 'হক কথা সোচ্চারে' বলার সাহসের উৎস যে উন্নত চেতনা, তাই যেন দু'জনের মধ্যে সহযোদ্ধার সম্পর্ক গড়ে দিয়েছে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই আমরা দু'জনের এক কাল্পনিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গোটা দেশ ও রাজ্যের বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়টাকে ধরার চেষ্টা করতে পারি।

দিশা ঃ মইদুল, তুমি এখন কোথায়? শুনলাম, তোমাদের সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই নবান্ন অভিযানের কর্মসূচী নিয়েছিল।

মইদুল ঃ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। ঐ কর্মসূচীতে হাজার হাজার ছাত্র-যুব কলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়েছে।

দিশা ঃ বাঃ! কী কী দাবি ছিল তোমাদের? তুমি গেছিলে তো?

মইদুল ঃ ছাত্র যুবদের যা দাবি হওয়া উচিৎ, সেই দাবিগুলোই ছিল। শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ, সব বেকারের কাজ, সরকারী দপ্তরের শূন্যপদে স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি চালু করা প্রভৃতি সাধারণ অথচ ভীষণ জরুরি কয়েকটি দাবি ছিল আমাদের।

দিশা ঃ একদম ঠিক। সারা দেশেই তো কর্মসংস্থান এখন একটা বড় সমস্যা। বিশেষ করে লকডাউনের ফলে তো বহু মানুষ কাজ হারিয়ে নতুন করে বেকার হয়ে গেছে।

মইদুল ঃ হ্যাঁ, সংখ্যাটা ১৫ কোটি। তবে শুধু লকডাউন বলছ কেন? তার আগে, ২০১৬-র নভেম্বরে যে নোটবন্দী করা হল? তার ধাক্কাতেও বহু ছোটো ছোটো কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল।

দিশা ঃ ঠিক বলেছ। করোনা আসার আগেই তো বেকারির হার গত ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল।

মইদুল ঃ তবে তোমায় জানাই, আমাদের রাজ্যের হাল আরও খারাপ।

দিশা ঃ কেন?

মইদুল ঃ লকডাউন আর নোটবন্দী ধাক্কা তো তোমার রাজ্যেও পড়েছে, আমার রাজ্যেও পড়েছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা আরও খারাপ বলছি, কারণ গত ১০ বছরে এই রাজ্যে কোনো বড় শিল্প হয়নি। সরকারী দপ্তরগুলিতে শূন্যপদে কোনো স্থায়ী নিয়োগ নেই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নেই। লেখা-পড়া জানা ছেলেমেয়েরা কাজ না পেয়ে চলে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে। তুমি বাঙ্গালোরেও দেখবে পশ্চিমবাংলার বহু ছেলেমেয়ে আছে।

দিশা ঃ হ্যাঁ জানি। কয়েকজনের সাথে কথাও হয়েছে। কিন্তু এত শূন্যপদ নিয়ে প্রশাসন চলছে কী করে? স্কুল-কলেজগুলোতে লেখা-পড়া হচ্ছে কীভাবে?

মইদুল ঃ অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে চুক্তিপ্রথায় কিছু নিয়োগ করে, আর অবশিষ্ট স্থায়ী কর্মচারীদের ওপর বিপুল কাজের বোঝা চাপিয়ে চলছে প্রশাসন। চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের সামান্য ভাতার বিনিময়ে স্থায়ী কর্মচারীদের মতোই খাটানো হচ্ছে।

দিশা ঃ যাই হোক, তোমরা ছাত্র-যুবরা লড়াইটা করছ শুনে ভালো লাগল। আমি ব্যাঙ্গালোরে থাকলেও, সোশ্যাল মিডিয়ায় তোমাদের রাজ্যের খবর কিছু পাই। এমন কিছু খবর পাই, যা আমাদের জানা বোঝা পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির সাথে একদম মেলে না।

মইদুল ঃ দিশা, তুমি ঠিকই বলেছ। নবজাগরণের উত্তরাধিকারী চেতনা আর বামপন্থার বিকাশ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে পশ্চিমবাংলায় যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তা আজ কার্যত ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। তুমি জান, আজ পশ্চিমবাংলায় সুস্থ রাজনৈতিক বিতর্কের কোনো টি আর পি নেই। অথচ রাজনৈতিক খেউর আর শালীনতার মাত্রা ছাড়া অশ্লীল শব্দের প্রয়োগের দারুণ টি আর পি।

দিশা ঃ ছিঃ!

মইদুল ঃ শুধু কী তাই? তুমি জান, আমাদেরই বয়সী বা আমার থেকেও ছোটো কত ছেলের দারিদ্র ও বেকারির সুযোগ নিয়ে তোলাবাজি, জুলুমবাজি, সিন্ডিকেট, কয়লা পাচার ও গরু পাচারের মতো বেআইনী কাজকর্মে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দিশা ঃ এসব শুনলে বড্ড আক্ষেপ হয়। আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ১৮-৪০ বছর বয়স সীমার মধ্যে। এই ডেমোগ্র্যাফিক ডিভিডেন্ডটা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে, দেশ গঠনের কাজে এই যুবশক্তিও সম্পদ হতে পারত। তা না করে, তুমি যেন বললে, তেমনই বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীদের খপ্পরে পড়েও তো কত যৌবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই যখন শুনলাম তোমরা ছাত্র-যুবদের সংগঠিত করে কর্মসূচী করছ, তখন খুব ভালো লেগেছিল। মনে হচ্ছিল, তা হলে সবটাই অন্ধকার নয়, আলোও আছে!

মইদুল ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। তবে আলো আছে শুধু নয়, সেই আলো ক্রমশ উজ্জ্বলও হচ্ছে। তুমি যে বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীদের কথা বললে, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে তাদের ঠাঁই ছিল না। কিন্তু এখন ছোবল মারার চেষ্টা করছে। রাজনীতির প্রাঙ্গণে ধর্মের প্রবেশ, পশ্চিমবাংলায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু এখন আর নিষিদ্ধ নয়।

দিশা ঃ হ্যাঁ, এখবর আমাদের কানেও আসে। সত্যিই আমরাও শকড্। বাবা-মার কাছে শুনেছি ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর সারা দেশে শিখ সম্প্রদায় আক্রান্ত হলেও, পশ্চিমবঙ্গে তারা ছিলেন নিরাপদ। '৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরেও পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার আগুন তো দূরের কথা, একটা ফুলকিও জ্বালাতে দেয়নি তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। পশ্চিমবাংলা ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানের সাম্প্রতিক দুর্বলতা গোটা দেশের কাছেই একটা অশনি সঙ্কেত।

মইদুল ঃ পশ্চিমবাংলার কালিমালিপ্ত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্যই তো সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের রুটি-রুজির সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে জোরদার করা হচ্ছে। কারণ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যত বেশি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে, ততই বিভাজনের রাজনীতি দুর্বল হবে।

দিশা ঃ ঠিক বলেছ, এর সব থেকে বড় উদাহরণ তো বর্তমান সময়ের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। কত ভাবেই তো ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ভাঙতে পারছে কই? বরং অন্যান্য অংশের খেটে খাওয়া মানুষ, বুদ্ধিজীবী সকলেই কৃষকের পাশে দাঁড়াচ্ছে।

মইদুল ঃ হ্যাঁ, আমাদের লড়াইয়েও কৃষকরা আজ অনুপ্রেরণা। তুমিও তো শুনলাম সোশ্যাল মিডিয়ায় কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে পোস্ট করেছ?

দিশা ঃ হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। আমি পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী সুইডেনের গ্রেটা থুনভার্গের একটি পোস্টকে আপডেট করে রি-পোস্ট করেছিলাম।

মইদুল ঃ হ্যাঁ, আমরাও খবর পেয়েছি গ্রেটা থুনবার্গের পোস্টের কথা। আর একজন আছেন, সঙ্গীত শিল্পী...

দিশা ঃ রেহানা। কিন্তু এই পোস্ট করার অপরাধে আমাকে বাড়ি থেকে তুলে এনে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লী পুলিশ। অভিযোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতার।

মইদুল ঃ সে কি তুমি এখন পুলিশের হেফাজতে? কৃষকদের সমর্থন করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা?!

দিশা ঃ শাসকের নতুন ভাষ্য তাই! গ্রেটা থুনবার্গ যেহেতু বিদেশিনী। তাই তার পোস্ট শেয়ার করাও নাকি দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে বিপজ্জনক।

মইদুল ঃ তাই? তাহলে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্ট্র্যাটেজিক চুক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে যৌথ সামরিক মহড়া, 'নমস্তে ট্রাম্প' কর্মসূচী—এসব কি দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে?

দিশা ঃ এর জবাব তো মানুষকেই চাইতে হবে। আমাকে তো কবে ছাড়বে জানি না। তোমরা লড়াইটা চালাও। মুক্ত হলেই আমিও যোগ দেব তোমাদের সাথে।

মইদুল ঃ লড়াই চলবে— দেশ ও রাজ্যের হাল না পাল্টানো পর্যন্ত। তুমি শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়, রাস্তায় নামো। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, কিন্তু একমাত্র নয়। রাস্তায় নেমে শাসকের চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করতে হবে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার বড় অংশ যুবক-যুবতী। কেন্দ্রের ও রাজ্যের শাসকরা চাইছে এই যুবক-যুবতীদের 'লুম্পেনাইজড্' করতে। আর আমরা যুবক-যুবতী বৃদ্ধদের পথে নামতে বলছি, আর্থিক বঞ্চনা ও সামাজিক লাঞ্ছনা অবসানের জন্য। তবে মানুষের মিছিলে আমার সাথে তোমার দেখা হবে না বন্ধু।

দিশা ঃ কেন একথা বলছ?

মইদুল ঃ আমি আর বাঁচবো না কমরেড। আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। দিশা, আমার খুব মনে পড়ছে কালো মানুষ জর্জ ফ্লয়েডের কথা। তোমার মনে আছে, ফ্লয়েডের মৃত্যুর পর 'ব্ল্যাক লাইভস্ ম্যাটার' আন্দোলন?

দিশা ঃ সে কথা কি ভোলা যায়?

মইদুল ঃ আমি না থাকলেও, তোমরা সবাই মিলে 'ইয়্যুথ ম্যাটারস্' 'ফার্মার্স ম্যাটার', 'ওয়ার্কার্স ম্যাটার' আন্দোলন গড়ে তুলো কমরেড। না হলে, আমাদের ভবিষ্যৎজুড়ে থাকবে শুধু অন্ধকার।

দিশা ঃ মইদুল, তুমি ঘুমাও কমরেড, আমরা জেগে থাকব। সমস্ত ধরনের স্বৈরাচারী শক্তিকে পরাস্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্রের জয়ধ্বজা ওড়াবোই। তোমার সন্তানদের জন্য এক নতুন ভারত গড়বোই।

মইদুল ঃ বিদায়, দিশা। বিদায় কমরেড। □

করোনা সংক্রমণ কেড়ে নিল যেসকল সাথীদের প্রাণ তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শোকজ্ঞাপন

উত্তর ২৪ পরগনা ঃ কবিতা দত্ত মজুমদার (নার্সেস), ব্রজেন্দ্র মণ্ডল (ফায়ার সার্ভিস), সুনীল কান্তি বোস (পেনশনার্স), ভবরঞ্জন দে (পেনশনার্স), মিনতি চক্রবর্তী (পেনশনার্স), নির্মাল্য ভট্টাচার্য্য (পেনশনার্স), মিহির গুহ (পেনশনার্স), তৃষাব নন্দী (পেনশনার্স), প্রেমাংশু গুহ (পেনশনার্স), সুশান্ত গোস্বামী (পেনশনার্স), অমল নাগ (পেনশনার্স), রুনা মিত্র (পেনশনার্স), সমর দত্ত (পেনশনার্স), গীতা ভট্টাচার্য্য (পেনশনার্স), হেমলাল চক্রবর্তী (পেনশনার্স), প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য (পেনশনার্স), রণজিৎ দে (পেনশনার্স), নবকুমার ঘোষ (পেনশনার্স), রণবীর দে (পেনশনার্স), স্বপন সিংহ রায় (পেনশনার্স), সত্যেন পাল (পেনশনার্স), শ্যাম চক্রবর্তী (পেনশনার্স), কমল রায় (পেনশনার্স)। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।